পন্নী পরিবারের
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

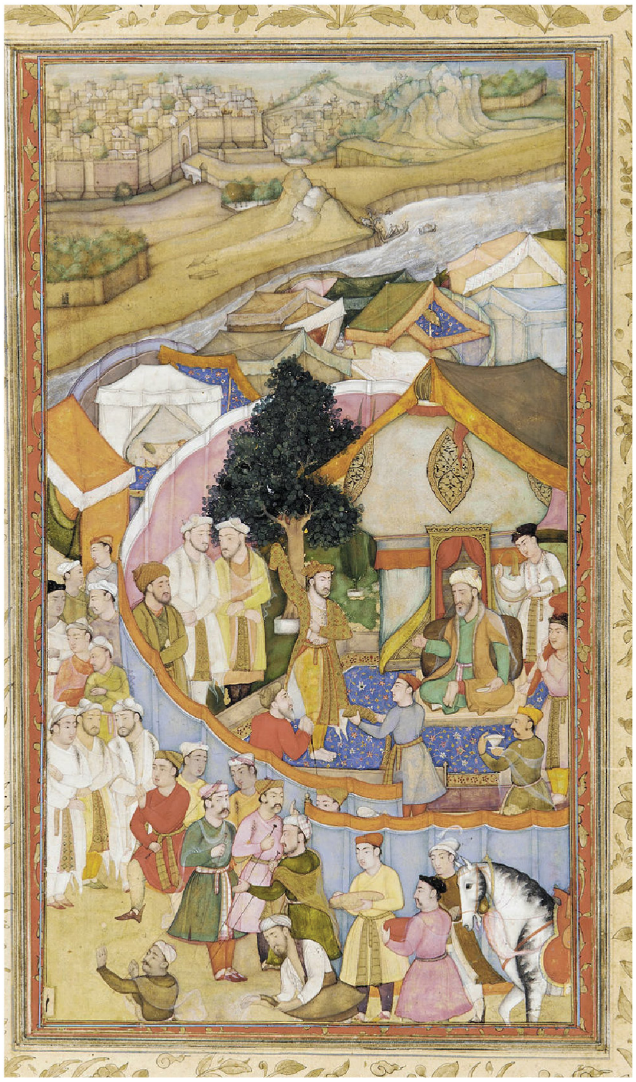

সম্পাদনাঃ রিয়াদুল হাসান

পত্নী পরিবারের
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

সম্পাদনাঃ রিয়াদুল হাসান

তওহীদ প্রকাশন

পন্নী পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

সম্পাদনাঃ রিয়াদুল হাসান

প্রথম প্রকাশঃ ৮ ফাল্গুন ১৪২৯, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

প্রচ্ছদ : সুয়াইবুল বান্না
লে-আউট কম্পোজিশন : ওবায়দুল হক বাদল
মূল্য : ৬০০ টাকা
সর্বস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়ঃ

তওহীদ প্রকাশন

১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

tawheedprocation@gmail.com

প্রাক-কথন

পন্নী পরিবারের গৌরবময় ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। না, এটা কোনো কথার কথা নয়। এ পরিবারের একজন পূর্বপুরুষ সৈয়দ রাজু মোহাম্মদ আল-হোসাইনি কাত্তাল (র.) হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় তাঁর মাজারশরিফে শায়িত আছেন। তাঁর অনুসারী ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে জানা যায় এই সুফি সাধকের জন্ম হয়েছিল ১০০২ সনে। অর্থাৎ আজ থেকে এক হাজার বছর আগে। কেবল ইসলামের প্রচার প্রসার নয়, ভারতবর্ষের রাজনৈতি উত্থান-পতনে এই পরিবারের সদস্যরা ভূমিকা রেখে আসছেন সেই সুলতানি যুগ থেকে। এমনকি গৌড়ের স্বাধীন সুলতান হিসাবে দীর্ঘ বারো বছর বঙ্গীয় অঞ্চল শাসন করেন আফগানিস্তান থেকে আগত এই পাঠান রাজবংশ। ইতিহাসের পাতায় তাঁরা 'কররানি রাজবংশ' হিসাবে চিহ্নিত। বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয় সুলতানি যুগের দুশ বছরের শাসনামলকে। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা মুসলিম সুলতানদের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হত। দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে নেওয়ার জন্য যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করলে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররানি সিংহের বিক্রমে দিল্লির শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করেন। অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য-সামন্তে তিনিও কম শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁর অধীনে ১ লক্ষ ৪০ হাজার পদাতিক, ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ২০ হাজার কামান, ৩ হাজার ৬শত হাতি এবং কয়েকশত রণতরী ছিল বলে জানা যায়। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজমহলে গৌড়ের সেনাবাহিনী ও মুঘল সেনাবাহিনীর মধ্যে এই সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। এতে সিংহের বিক্রমে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দেন দাউদ খান কররানি। বন্দী করা হয় তাঁর পরিবারকে। এর দুই যুগ পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাইদ খান পন্নীকে টাঙ্গাইলের আতিয়া পরগনার সুবেদার নিয়োগ করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত আতিয়া মসজিদ এখনও সগৌরবে পন্নী পরিবারের মাহাত্ম্য প্রচার করছে।

তাঁর বংশধরেরা টাঙ্গাইল মির্জাপুরের গোড়াইতে নগর নির্মাণ করেন যার ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। তাঁরা পরবর্তীতে করটিয়াতে গিয়ে বসত করেন। তখন ব্রিটিশযুগ। ব্রিটিশদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ও অসহযোগিতার দরুণ তাদের জমিদারি ধীরে ধীরে জৌলুস হারাতে থাকে। ব্রিটিশ যুগে মুসলিম রেনেসাঁর পুরোধা ছিল পন্নী জমিদার পরিবার যা ইতিহাসের ছাত্ররা নিশ্চয়ই বিস্মৃতি হননি। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া, কবি সুফিয়া কামাল, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, কবি গোলাম মুস্তফা, মীর মোশাররফ হোসেনের মত সাহিত্যিকদের জীবন ও কীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পন্নী পরিবারের নাম। ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া এদেশের মানুষের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাচ্যের আলিগড় বলে খ্যাত সা'দত কলেজসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া)। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পূর্বে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল্। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনেও রয়েছে পন্নী পরিবারের অবদান।

এ পরিবারেই জন্ম নিয়েছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ যিনি একাধারে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ; যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা-সংবলিত যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য প্রভূত গ্রন্থ রচনা করে জঙ্গিবাদ, ধর্মব্যবসা, ধর্মের নামে অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলাম বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। পাশাপাশি ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত এ সকল বিষবৃক্ষের মুলোৎপাটনের জন্য হেযবুত তওহীদ নামক একটি দুঃসাহসী, দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে গণমানুষের মাঝে এক নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর ধ্বজা উত্তোলন করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত আদর্শকে কেন্দ্র করে আজ বাংলাদেশের ইসলামের উত্থানকামীদের স্বপ্ন-সাধনা আবর্তিত হচ্ছে। এ বইটিতে তাঁর কর্মময় জীবনের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। পন্নী পরিবারের উপর অনেক গবেষণাগ্রন্থ বাজারে থাকলেও এ বইটি পাঠকের সামনে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

সূচিপত্র

পন্নী পরিবারের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস...৬
মাননীয় এমামুয্যামানের সংক্ষিপ্ত জীবনী..২২
ঐতিহাসিক জনপদ আতিয়ার প্রশাসক সাঈদ খান পন্নী..৬৭
মাসিকপত্র আখ্বারে এসলামীয়া, হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর.. .... ৭৩

এমামুয্‌যামান

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রতিষ্ঠাতা, হেযবুত তওহীদ

পন্নী পরিবারের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস

রিয়াদুল হাসান

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রপিতামহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের একজন রাজকন্যাকে বিবাহ করেন যাঁর নাম আয়েশা খানম। এটি সেই বিয়ের কাবিন নামা। আয়েশা খানমের গর্ভজাত কন্যা রওশন আখতার বেগমের বিয়ে হয় ঢাকার ইতিহাসখ্যাত নবাব স্যার সলিমুল্লাহর সঙ্গে।

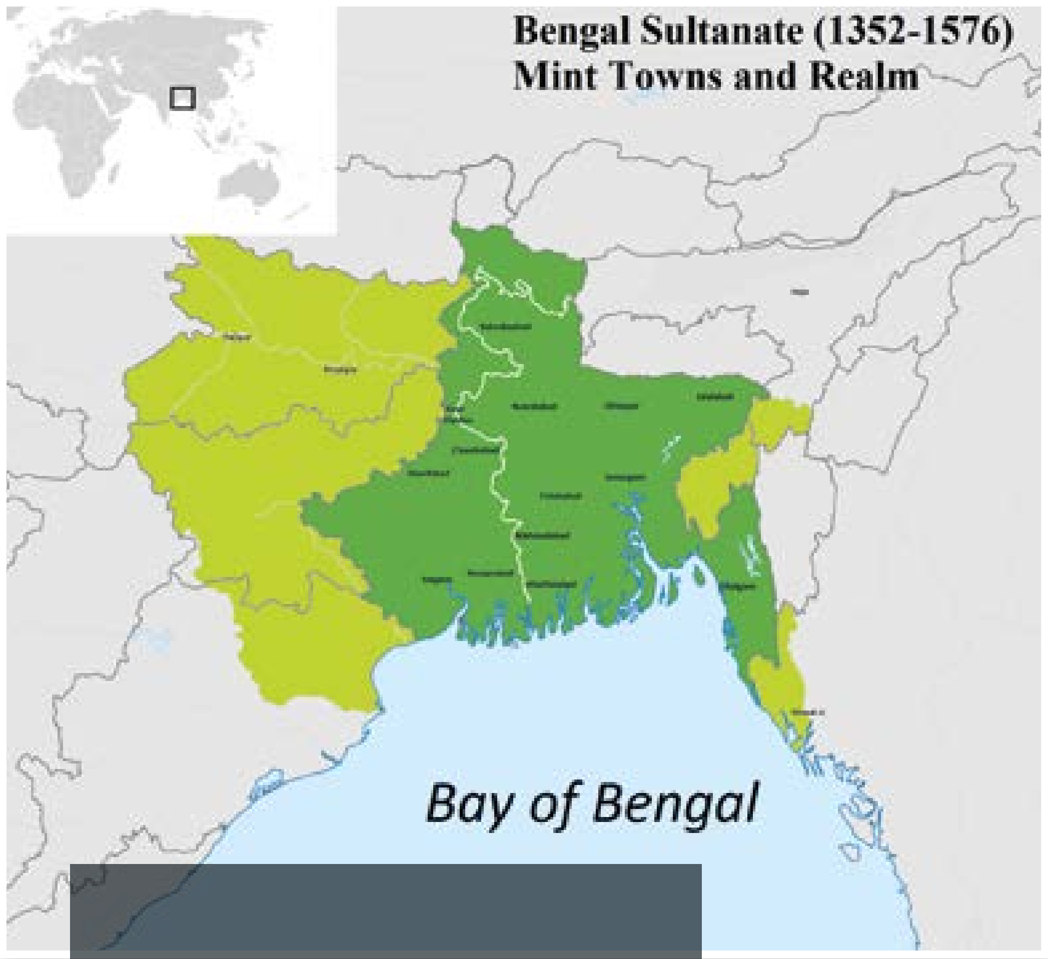

১৩৫২-১৫৭৬

স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার মানচিত্র। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত এই রাজ্যের শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান কররানি।

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এমন এক পরিবারের সন্তান যাঁদের কীর্তির সঙ্গে আবহমান বাংলার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি একসূত্রে গাঁথা। তিনি রসুলাল্লাহর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.) এর বংশধর। সেই সূত্রে তাঁর ধমনীতে রসুলে পাক (দ.) এর পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, শাসন পরিচালনা ও শৌর্যবীর্যের অপূর্ব সমন্বয় পরম্পরারূপে যুগপৎ বিরাজ করছে। এ বংশধারায় একদিকে যেমন জন্ম নিয়েছেন অনেক সুফি, দরবেশ, আধ্যাত্মিক পুরুষ, অপরদিকে এ বংশে জন্ম নিয়ে বহু দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ও শাসকও পৃথিবীর বুকে তাদের অক্ষয় কীর্তি রচনা করে গেছেন। হজরত শাহ রাজু কাতাল হোসাইনী (র.), হযরত সৈয়দ মুহম্মদ হোসাইনী খাজা বন্দে নেওয়াজ গেসু দরাজ (র.) প্রমুখ সুফি সাধকগণ তাঁরই সম্মানিত পূর্বপুরুষ যাঁরা মুসলিম শাসনামলের স্বর্ণযুগে ভারতের মাটিতে দেহরক্ষা করেছেন। হায়দ্রাবাদ ও কর্নাটকে অবস্থিত তাঁদের দরগাহ শরীফগুলো আজও লাখো ধর্মপ্রাণ মানুষের তীর্থক্ষেত্র।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ সুলতান দাউদ খান কররানির সময়ের মুদ্রা। মুদ্রার একপৃষ্ঠে দাউদ খানের নাম অপরপৃষ্ঠে কলেমা তাইয়্যেবা অঙ্কিত। কররানি আমলের এই মুদ্রা জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

২৮৪

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم -

করটিয়া পন্নী পরিবারের পূর্বপুরুষ সেলিম চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র মঙ্গন চৌধুরীর বরাবরে মুঘল সম্রাট আলমগীর বাদশা গাজী আবুল মোজাফ্ফর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন প্রদত্ত সনদ **(আতিয়ানামা)**।

সুলতানি যুগ:

মুসলিম সুলতানি যুগকে বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। সেই সুলতানি যুগে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বৃহত্তর বঙ্গের সুলতান। তাঁদের শাসনামল কররানি যুগ (Karrani Dynasty) বলে পরিচিত। সুলতানিযুগে যে রাজবংশগুলো স্বাধীনভাবে অথবা দিল্লীর অধীনে থেকে গৌড় তথা বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাদের সময়কাল নিম্নরূপ।

১	খিলজি রাজবংশ (১২০৪ - ১২২৭)
২	মামলুক রাজবংশ (১২২৭ - ১২৮১)
৩	বলবন রাজবংশ
৪	তুঘলক রাজবংশ (১৩২৪ - ১৩৫২) রাজবংশ (১২২৭ - ১২৮১)
৫	ইলিয়াস শাহি রাজবংশ (১৩৫২-১৪১৪)
৬	বায়েজিদ শাহি রাজবংশ(১৪১৩-১৪১৪)
৭	রাজা গণেশের পরিবার (১৪১৪-১৪৩৫)
৮	পুনপ্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহি রাজবংশ (১৪৩৫-১৪৮৭)
৯	হাবশি শাসন (১৪৮৭-১৪৯৪)
১০	হোসেন শাহি রাজবংশ (১৪৯৪-১৫৩৮)
১১	সুরি সাম্রাজ্যের অধীন বাংলার গভর্নর (১৫৩২-১৫৫৫)
১২	মুহাম্মদ শাহ রাজবংশ (১৫৫৪-১৫৬৪)
১৩	**কররানি রাজবংশ (১৫৬৪-১৫৭৬)**

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ সুলতান সোলায়মান খান পন্নী (কররানি) তাঁর শাসনামলে (১৫৬৫-১৫৭২) বঙ্গের রাজধানী গৌড় থেকে ভারতের তাণ্ডায় স্থানান্তরিত করেন। এটিই স্বাধীন সুলতানিশাসনামলের শেষ রাজধানী। উল্লেখ্য, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সুলতান সোলায়মান খান পন্নীর দ্বাদশ অধস্তন পুরুষ।

১৫৬৩ - ১৫৭৬ পর্যন্ত তাজ খান কররানি, সোলায়মান খান কররানি, বায়াজীদ খান কররানি ও দাউদ খান কররানি গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁরা ত্রিপুরা থেকে ভারতের উত্তর প্রদেশ, হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে পুরি পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের সুলতান ছিলেন। কররানি রাজবংশের দুর্ধর্ষ সেনাপতি কালাপাহাড় নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি গৌড়ের সীমানাকে কামরূপ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কালাপাহাড়ের নাম আজও মানুষের মুখে এবং বাংলা সাহিত্যে-ইতিহাসে গৌরবময় যুদ্ধজয়ের নায়ক হিসাবে কিংবদন্তীর মতো ঠাঁই পেয়ে আসছে। কবি নজরুল ইসলামও তাঁর বিখ্যাত মানুষ কবিতায় লিখেছেন-

> "কোথা চেঙ্গিশ, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়
> ভেঙে ফেল এই ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।"

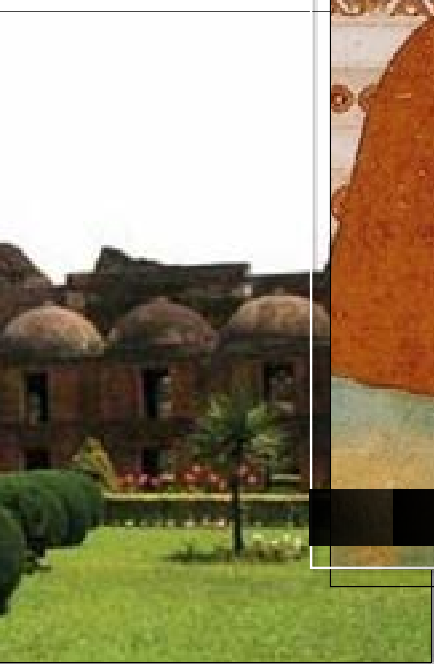

মির্জা আজিজ কোকা

সম্রাট আকবরের বাল্যবন্ধু ও পালক ভাই মির্জা আজিজ কোকা যিনি খান-ই-আজম নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৫৮২-১৫৮৩ সনে তিনি সুবে বাংলার সুবেদার হন। ১৫৭৬ সনে কররানি সুলতানদের পরাজয়ের পর সেনাপতি কালাপাহাড় অপর এক আফগান সর্দার মাসুম কাবুলির বাহিনীতে যোগ দেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সেনাপতি খান-ই-আজম মির্জা আজিজ কোকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মাসুম কাবুলি পরাস্ত হলে সেই যুদ্ধে কালাপাহাড়ও নিহত হন।

সুলতানিযুগে বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের প্রবেশদ্বার বা দাখিল দরওয়াজা।

সুলায়মান খান কররানি দিল্লির সম্রাট আকবরের সঙ্গে কূটনৈতিক শান্তি বজায় রেখেই রাজ্যশাসন ও বিস্তার করেন। ইসলামের শিক্ষাকে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং বহু সুফি-দরবেশকে অঢেল ভূসম্পত্তি প্রদান করে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ফলে ঐ সমস্ত সুফি সাধকগণ ইসলামের প্রচার-প্রসারে পূর্ণাঙ্গরূপে মনোনিবেশ করেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, শাসক সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে বাংলায় মুসলমানদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হতো না। সোলায়মান খান কররানির প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর মধ্যে পুরানো মালদহের সোনা মসজিদ, চট্টগ্রামের বখশী হামিদ মসজিদ আজও টিকে আছে। এই মসজিদগুলোর শিলালিপিতে সোলায়মান খান কররানির নামও খোদাই করা রয়েছে।

সোলায়মান খান কররানির প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের বখশী হামিদ মসজিদ।

দাউদ খান কররানির সেনাবাহিনীতে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৩,৬০০ হাতি, ১১,৪০,০০০ পদাতিক ও ২০,০০০ কামান ছিল।

পিতা সুলায়মান খান কররানির মৃত্যুর পর ক্ষমতা লাভ করেই বায়াজীদ খান কররানি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর নামানুসারেই টাঙ্গাইলের বাজিতপুর গ্রাম ও কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থানার নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। মাত্র কয়েকমাস পর তিনি ঘাতকের দ্বারা নিহত হলে তাঁরই ছোট ভাই দাউদ খান কররানি সিংহাসনে বসেন। এ সময় তাঁর সেনাবাহিনীতে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৩,৬০০ হাতি, ১১,৪০,০০০ পদাতিক ও ২০,০০০ কামান ছিল যা নিয়ে তিনি মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এতটাই দুঃসাহসী ছিলেন যে তিনি সমগ্র ভারত উপমহাদেশ জয় করতে চেয়েছিলেন। জামানিয়া, পাটনা, তুকারয়ের যুদ্ধের পর ১২ জুলাই ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক রাজমহলের যুদ্ধে (রাজমহল স্থানটি বর্তমানে ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত) তিনি বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। এর মাধ্যমেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-উত্তর প্রদেশ নিয়ে গঠিত বিরাট গৌড় অঞ্চলের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

তবে কররানি সুলতানদের সেনানায়কগণ, এদেশের বিভিন্ন এলাকা শাসনকারী জমিদারগণ এত সহজে মুঘলদের আধিপত্য মেনে নেয়নি। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) তার জীবদ্দশায় সমগ্র বাংলার উপর মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। কারণ বাংলার বড় বড় জমিদারেরা যাদের অনেকেই আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন, তারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তারা বারভুঁইয়া নামে পরিচিত। এখানে 'বারো' বলতে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায়। তারা অনেকবার কেন্দ্রীয় শক্তিকে পরাস্ত করে নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করেছেন। এদের মধ্যে ঈসা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলী, মুসা খাঁ, ফজল গাজী, খাজা উসমান খাঁ লোহানী, বায়েজিদ কররানি, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ের সুলতান দাউদ খান কররানি ও মুঘল বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত ঐতিহাসিক রাজমহলের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমেই বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিল্লির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় **(তারিখ ই বাদাউনি)**।

১৫৭৫ সনে মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে গৌড়ের সুলতান দাউদ খান কররানির একটি ঐতিহাসিক রাজ্যসীমা নির্ধারণী চুক্তি হয় যা কটক চুক্তি নামে পরিচিত। সম্রাটের পক্ষ থেকে সেনাপতি মোনায়েম খান এই চুক্তিটি সম্পাদন করেন। চুক্তিটি হস্তান্তরকালে মোনায়েম খান সুলতানকে একটি রাজকীয় আলখেল্লা (কাফতান) উপহার হিসাবে প্রদান করেন।
(সূত্র: উইকিপিডিয়া)

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার নামকরণের পেছনেও রয়েছে এমামুয্যামানের পুর্বপুরুষ কররানি সুলতানদের স্মৃতি। বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী এই ভূমিতে কররানি সুলতানদের সেনাবাহিনী মুঘল সেনাবাহিনীর মোকাবেলার জন্য শিবির স্থাপন করেছিল বলে এই এলাকার নাম হয়েছিল কেরানীগঞ্জ। **(তথ্য: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)**

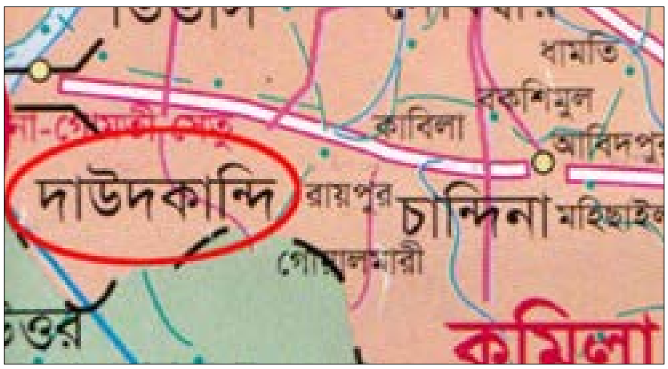

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমামুয্যামানের পূর্বপুরুষ বঙ্গের শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান পন্নীর স্মৃতি।

উক্ত বায়েজিদ কররানি সম্রাট আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সিলেটের রাজা ছিলেন। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফগান সর্দার তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ চিশতীর বাহিনীর সঙ্গে আফগান সর্দারদের চূড়ান্ত লড়াই হয় এবং এতে বায়েজীদ খান কররানির পতনের মাধ্যমে মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ স্ফুলিংগ নিভে যায় এবং গোটা বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। উল্লেখ্য, দাউদ খান কররানির নাম থেকে কুমিল্লার দাউদকান্দি এবং কররানি থেকেই ঢাকার কেরানিগঞ্জ থানার নামের উৎপত্তি হয়েছে। জনপ্রিয় দাদখানি চালের নামকরণের নেপথ্যেও রয়েছে দাউদ খানের ইতিহাস। দাউদ খান কররানির আমলে বঙ্গদেশে এ চালের চাষাবাদ শুরু হয়। সুলতানের দরবারে চালটির বেশ চাহিদা ছিল। দাউদ খান নিজেও চালটি খুব পছন্দ করতেন। তাই এর নাম হয়ে যায় দাউদখানি চাল। যার অপভ্রংশ দাদখানি চাল। [সূত্র: বাংলা ভাষার মজা- ড. আমিন মোহাম্মদ]

মুঘল যুগঃ

ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত পালামৌ দুর্গ। ১৬৬০ সনে বিহারের মুঘল সুবেদার দাউদ খান পন্নী রাজা মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা করায়ত্ব করেন। তিনি পুরাতন দুর্গটির সংস্কারসাধন ও পুনর্নির্মাণ করেন। **(সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)**

এরও অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করে যখন দিল্লির মসনদে আসীন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তখনও পন্নী পরিবারের আরেক বীরপুরুষ, যার নামও দাউদ খান পন্নী, তিনি নিজের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে। ১৬৬০ সনে বিহারের মুঘল সুবেদার দাউদ খান পন্নী রাজা মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা করায়ত্ব করেন। তিনি পুরাতন পালামৌ দুর্গটির সংস্কারসাধন ও পুনর্নির্মাণ করেন।

আরো চল্লিশ বছর পর যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী এ সময় বিভিন্ন ময়দানে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন ভারতের দক্ষিণ উপকূলে চেন্নাইয়ের করমান্ডেলে সেইন্ট জর্জ ফোর্ট নামে ইংরেজদের একটি সেনাঘাটি ছিল। **১৭০২ সনে সম্রাটের নির্দেশে দাউদ খান পন্নী সেই দুর্গ অবরোধ করেন এবং তিন মাস অবরোধের পর ইংরেজরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়।** এরপর সম্রাট তাঁকেই ঐ এলাকার সেনাপ্রধান হিসাবে ১৭০৩ সনে দায়িত্ব অর্পণ করেন। **তাঁর নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ও যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে ১৭১০ সনে সমগ্র মুঘল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক** (Commander-in-Chief of the Mughal Army) **পদে নিয়োজিত করেন।**

একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে, সুলতান দাউদ খান পন্নী যে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধেই দুর্দান্ত লড়াই করে জীবন উৎসর্গ করেন, তাদের বশ্যতা মেনে নেন নি, ঠিক ১৩৪ বছর পর তাঁরই বংশের আরেক দাউদ খান পন্নী অসম্ভব সামরিক প্রতিভা, দুঃসাহসী নেতৃত্বের গুণে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসক সেই মুঘল সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Commander-in-Chief of the Mughal Army) হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে দাউদ খান পন্নী দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নওয়াব (Nawab of the Carnatic Sultanate) পদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনিও ১৭১৫ সনে একটি যুদ্ধে তিনি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েও দুর্ঘটনাবশত প্রাণ হারান। এভাবে ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কররানি তথা পন্নী পরিবারের সদস্যদের বীরত্বের গাঁথা। স্বাধীনচেতা মনোভাব, দুর্ধর্ষতা, শাসন পরিচালনা ও দুঃসাহসিকতার এই ধারা পন্নী পরিবারের রক্তকণিকায় বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে যা ভারতজুড়ে সংঘটিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেও প্রমাণিত হয়েছে। যাহোক, আমরা আবার বাংলার মাটিতে ফিরে আসি।

রাজমহলের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সুলতান দাউদ খান কররানি ও সুলতান বায়াজীদ খান কররানির পরিবারের সদস্যদের অনেককেই দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা বেশ সম্মানের সঙ্গেই ফতেহপুর সিক্রিতে বসবাস করতে থাকেন। আতিয়ার প্রখ্যাত সুফি সাধক বাবা আদম কাশ্মিরীর খলিফার পরামর্শে সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) তাঁদেরই জীবিত বংশধর সাইদ খান পন্নীকে (পিতা সুলতান বায়াজীদ খান কররানি) ময়মনসিংহ, ঢাকা ও রাজশাহীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত আতিয়া পরগনার সুবেদার হিসাবে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আতিয়া মসজিদের ছবি বাংলাদেশে প্রচলিত দশ টাকার নোটে মুদ্রিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি আতিয়া মসজিদ। নির্মাতা সুলতান বায়াজীদ খান পন্নী (কররানি) এর পুত্র আতিয়া পরগনার সুবেদার সাইদ খান পন্নী। দশ টাকার নোটে এই মসজিদটির ছবি মুদ্রিত হয়।

ব্রিটিশ যুগঃ

ব্রিটিশ আমলেও এ অভিজাত পন্নী পরিবারের জমিদারী বজায় থাকে। প্রজাহিতৈষণা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য তারা ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ন্যায়-অন্যায় বা যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদাভেদ তাঁরা করেননি। ফলে তারা সকলেই হিন্দু প্রজাদের বিশ্বস্ততা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন।

১৯২৭ সালে দার্জিলিং এর ইডেন ক্যাসেলে ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর সাথে এইচ ই লর্ড লিটন (বসা বাঁ থেকে দ্বিতীয়), গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, লর্ড ইরুইন (নবাবের পাশে), করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী, এস এম মুসাভী (দাঁড়িয়ে ডানের শেষ দু'জন)।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার নাম মাসিক 'আখবার-এ-ইসলামিয়া'। এর সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামি লেখক, বাংলা ভাষায় পবিত্র কোর'আন শরীফের প্রথম অনুবাদক মৌলবি নঈমুদ্দীন। যে ছাপাখানা থেকে এই পত্রিকাটিসহ অন্যান্য পুস্তকাদি প্রকাশ করা হতো তার নাম ছিল 'মাহমুদিয়া যন্ত্র'। এই ছাপাখানাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রপিতামহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী। পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর নব-জাগরণের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রায় দশ বছর পত্রিকাটি প্রকাশ করে গেছেন।

১৮৮৮ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত জমিদারদের সঙ্গে সামনের সারিতে সৈয়দ আব্দুল জব্বার চৌধুরী (দেলদুয়ার জমিদার), হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী (করটিয়ার জমিদার) এবং সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী (ধনবাড়ির জমিদার)।

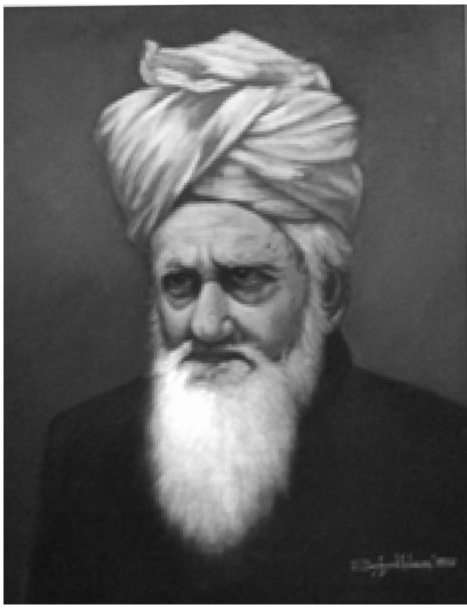

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর শ্রদ্ধেয় দাদাজান করটিয়ার জমিদার সুফি সাধক মাহবুবে খোদা হযরত হায়দার আলী খান পন্নী (রহঃ)।

ব্রিটিশ শাসকদের প্রদত্ত খেতাব Companions of the Order of the Indian Empire (CIE) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মায়ের নানা ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহও ছিলেন পন্নী পরিবারের জামাতা। ১৯১২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি ঢাকার রমনা এলাকায় নিজ ৬০ একর জমিসহ ১,৮৬,৯০০ টাকা দান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন মহামান্য এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মায়ের নানা। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলমান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে অর্থাভাব দেখা গেলে নিজ জমিদারীর একাংশ বন্ধক রেখে এককালীন ৩৫,১৫০ টাকা প্রদান করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন"-টি তাঁরই স্মৃতি বহন করছে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে পন্নী জমিদারগণ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। এমামুয্যামানের দাদা প্রখ্যাত সুফি সাধক মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নী ব্রিটিশ শাসকদের প্রদত্ত খেতাব Companions of the Order of the Indian Empire (CIE) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এমামুয্যামানের দাদার বড় ভাই করটিয়ার জমিদার আটিয়ার চাঁদ ও দানবীর খ্যাত ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁন মিয়া)।

এমামুযযামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ও তাঁর কনিষ্ঠ স্ত্রী তুর্কী সাম্রাজ্যের একজন রাজকন্যা আয়েশা খানমের কন্যা রওশন আরা খানমের সঙ্গে স্যার সলিমুল্লাহ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রীর বড় ভাই ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সঙ্গে তিনি এদেশের শিক্ষাবিস্তারে একযোগে কাজ করেন।

"বাংলার অন্যান্য জমিদাররা যদি চাঁদ মিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করতো তবে জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষে যেতাম না।" –মাওলানা ভাসানী

তারই বড় ভাই আতিয়ার চাঁদ খ্যাত দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া তার জমিদারি অকাতরে বিক্রি করে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তহবিল যুগিয়েছিলেন, জমিদার হয়েও ঔপনিবেশিক সরকারের বদলে প্রজাস্বার্থ সংরক্ষণের অপরাধে কারাভোগ করেছিলেন।

জনকল্যাণমূলক কাজে, বিশেষ করে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী যে বিপুল অবদান রেখেছিলেন সমকালে মুসলিম জমিদারদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যায় না। সমকালীন জমিদাররা যে সময় অমিতব্যয়িতা ও নানা ধরনের বিলাস-ব্যসনে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেসময় তিনি শিক্ষাবিস্তার ও জনহিতার্থে নিজের সুবিশাল জমিদারির অধিকাংশ ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। সমগ্র বাংলায় হাজী মহম্মদ মহসীন ছাড়া এরূপ দানের দৃষ্টান্ত আর নেই। উপন্যাস ও নাটক-সিনেমার কল্যাণে জমিদার বললেই আমাদের মনে অত্যাচারী, নারীলোভী, পরসম্পদ লুণ্ঠনকারী, ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত যে সামন্তপ্রভুর চিত্র ভেসে ওঠে পন্নী জমিদারগণ ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সম্পর্কে বলেছেন, "বাংলার অন্যান্য জমিদাররা যদি চাঁদ মিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করতো তবে জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষে যেতাম না।" **(সূত্র: টাঙ্গাইলের হাজার বছরের ইতিহাস- আলহাজ্ব কাজী নূরুল ইসলাম এডভোকেট)**

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ হিসেবে সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠা-সহ শিক্ষাবিস্তারে তাঁর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের ফলেই পল্লীবাংলার নিভৃত জনপদ করটিয়া বাংলাদেশে পরিচিতি পায়, সম্মানের অধিকারী হয়। সেসময়ের করটিয়া কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। তিনি লিখেছিলেন: "করটিয়া শুধু একটা সাধারণ বিদ্যাপীঠ নয়- এ একটা অভিনব জ্ঞান-কেন্দ্র। অতীতের আল-আজহার, বোগদাদের স্বপ্ন দেখছে করটিয়া।" **('নজরুলের একটি চিঠি' বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭২, পৃ. ১০৫-১১৬)**

সুলতান সোলায়মান খান কররানি থেকে মাননীয় এমামুয্যামানের বংশলতিকা নিম্নরূপ:

১	হজরতে আলা মিয়া সোলায়মান কররানি
২	সুলতান বায়েজিদ খান কররানি
৩	সাইদ খান পন্নী
৪	মুনায়েম খান পন্নী
৫	খোদা নেওয়াজ খান পন্নী
৬	আলেপ খান পন্নী
৭	ফয়েজ আলী খান পন্নী
৮	সা'দত আলী খান পন্নী
৯	হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী
১০	মাহবুবে খোদা হজরত হায়দার আলী খান পন্নী (রহ.)
১১	মেহেদী আলী খান পন্নী
১২	**মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী**

এমামুয্যামানের বাবা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী।

মাননীয় এমামুয্যামানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী (Versatile Genius) ছিলেন।

এই ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান মাননীয় এমামুয্যামানও ছিলেন আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলিয়ান এমন এক মহান পুরুষ যাঁর ঘটনাবহুল ৮৬ বছরের জীবনে একটি মিথ্যা বলার বা অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্ত নেই। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী (Versatile Genius) ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লব, রাজনীতি, সমাজ উন্নয়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা, সঙ্গীত, শিকার, ক্রীড়ানৈপুণ্য, সাহিত্যচর্চা, গবেষণা, ইসলামী আন্দোলনের প্রবক্তা ইত্যাদি বহুবিধ অঙ্গনে তিনি অপূর্ব দক্ষতা ও মেধার সাক্ষর রেখেছেন।

শৈশব

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ১১ মার্চ ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে শবে বরাতের বরকতময় রজনীতে উপমহাদেশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মুস-লিম জমিদার পরিবারের একটিতে অর্থাৎ পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃনিবাস টাঙ্গাইল করটিয়া জমিদার বাড়ির ছোট তরফ। পিতা মোহাম্মদ মেহেদী আলী খান পন্নী।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ
বায়াজীদ খান পন্নীর বাল্যকালের ছবি

শিক্ষাজীবন:

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকেয়া উচ্চ মাদ্রাসায়, দু'বছর তিনি সেখানে পড়াশুনা করেন। তারপর এইচ. এম. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর বাংলার আলিগড় নামে প্রসিদ্ধ করটিয়া সা'দাত কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। এ সবগুলো প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুসলিম নবজাগরণের অগ্রদূৎ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া। এরপর মাননীয় এমামুয্যামান ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর পৌত্র নওয়াবজাদা মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ছিলেন এমামুয্যামানের খালু, যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এমামুয্যামান তাঁর এই খালুর বাড়ি বগুড়ার নওয়াব প্যালেসে থেকে প্রথম বর্ষের পাঠ সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন। একই কলেজে তখন পড়াশুনা করতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরা উভয়েই একই হোস্টেল অর্থাৎ বেকার হোস্টেলে থাকতেন।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী যখন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র

সাল: ১৯৫৪ খ্রি.

ডানে: পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী করটিয়ার জমিদার পন্নী বাড়িতে সফররত। পাশে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন।

এমামুয্যামানের খালুর বাসভবন মোহাম্মদ আলী প্যালেসের ডায়নিং হল। এই বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী মেট্রিকুলেশন পাস করেন।

এমামুযযামানের শিক্ষাজীবনের শুরু হয় পিতামহ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোকেয়া মাদ্রাসায়।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বেকার হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতেন। বঙ্গবন্ধুও একই কলেজে পড়তেন এবং একই হোস্টেলে বাস করতেন। এই হোস্টেলটি প্রতিষ্ঠার পেছনেও এমামুযযামানের পূর্বপুরুষদের বিশেষ অবদান ছিল।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সম্মানিত পূর্বপুরুষ করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া) কর্তৃক ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সা'দত কলেজ। এমামুয্যামান এই কলেজে ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষে কিছুদিন পড়াশুনা করেন।

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম:

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তেহরিক-ই-খাকসারের ইউনিফর্ম পরিহিত ২২ বছরের তরুণ এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

মাত্র ২২ বছর বয়সে দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে Special Assignment -এর জন্য 'সালার-এ-খাস হিন্দ' মনোনীত হন তিনি।

কলকাতায় শিক্ষালাভের সময় ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তাল। তরুণ এমামুয্যামানও এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সুবাদে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের বহু কিংবদন্তী নেতার সাহচর্য লাভ করেন। যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, যুগান্তর দলের নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম।

এমামুয্যামান যোগ দিয়েছিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকী প্রতিষ্ঠিত 'তেহরিক-ই-খাকসার' আন্দোলনে। ছাত্র বয়সে একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগদান করেও তিনি দ্রুত জ্যেষ্ঠ নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের পদ লাভ করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে Special Assignment -এর জন্য 'সালার-এ-খাস হিন্দ' মনোনীত হন।

দেশবিভাগের পর করটিয়ায় আগত ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন তেহরিক-ই-খাকসারের কর্মীদের সেলুট গ্রহণ করছেন এমামুয্যামান ও তাঁর পিতা করটিয়ার জমিদার মেহদী আলী খান পন্নী।

শিকারী জীবন:

পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পশু শিকার করার নেশা ছিল তাঁর। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি কুমির শিকার করেন, প্রথম চিতাবাঘ শিকার করেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন।

সুপাঠ্য এ বইটি এক সময়ে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বইয়ে তিনি সুন্দরবনকে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম জঙ্গল হিসাবে এবং সিংহের পরিবর্তে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পশুর রাজা হিসাবে অকাট্য যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরেন।

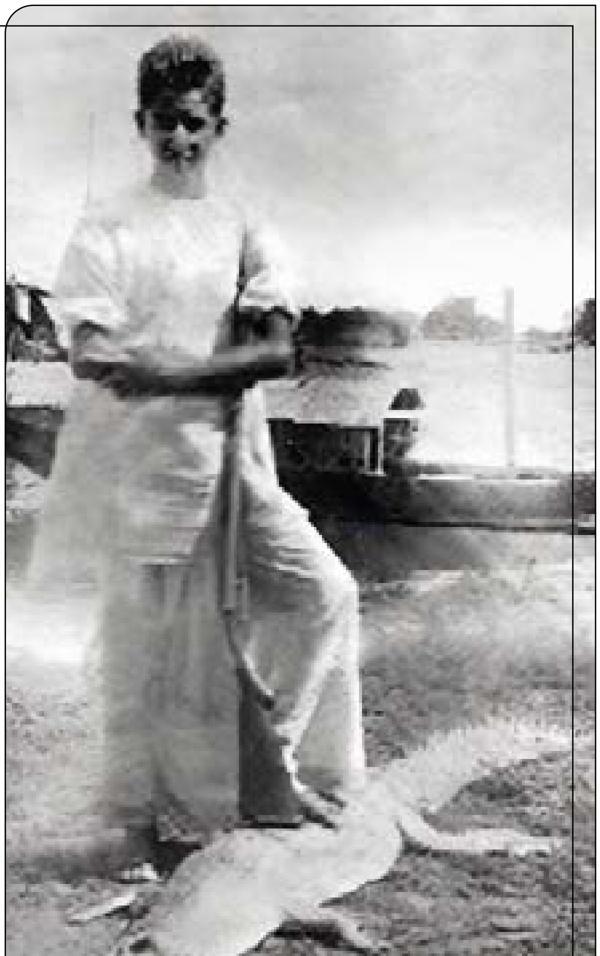

১৪ বছর বয়সে বংশাই নদীতে শিকার করা প্রথম কুমির এবং ১৭ বছর বয়সে প্রথম শিকার করা চিতাবাঘের সঙ্গে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

বইটি সম্পর্কে পাকিস্তান লেখক সংঘের সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন: “বাঘ-বন-বন্দুক এক উপেক্ষিত এবং অনাস্বাদিত জগতের যাবতীয় রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠাকে এমন সরসরূপে উপস্থিত করেছে যে পঞ্চমুখে আমি তার তারিফ করতে কুণ্ঠিত নই।... আমি বিশেষ করে মনে করি এই বই আমাদের দশম কি দ্বাদশ শ্রেণীর দ্রুতপাঠের গ্রন্থরূপে গৃহিত হওয়া উচিত।” সুপাঠ্য এ বইটি এক সময়ে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে তিনি সুন্দরবনকে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম জঙ্গল হিসাবে এবং সিংহের পরিবর্তে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পশুর রাজা হিসাবে অকাট্য যুক্তি, তথ্য, প্রমাণ তুলে ধরেন।

LAHORE
DACCA
KARACHI
Pakistan Writers' Guild

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর শিকার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা বই বাঘ-বন-বন্দুক সম্পর্কে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক শহীদ অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর লিখিত মন্তব্য। তাঁর সুপারিশে বইটি দশম শ্রেণির দ্রুতপাঠ গ্রন্থ হিসাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাত্র ১৭ বছর বয়সে শিকার করা প্রথম চিতাবাঘের মাথা।

ক্রীড়াজীবন:

তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন প্রথম সারির রায়ফেল শ্যুটার। রায়ফেল শ্যুটার হিসাবে ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি একজন নিয়মিত ফুটবলার ও মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট ছিলেন।

এমামুযযামান ১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বপ্রথম রায়ফেল শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন।

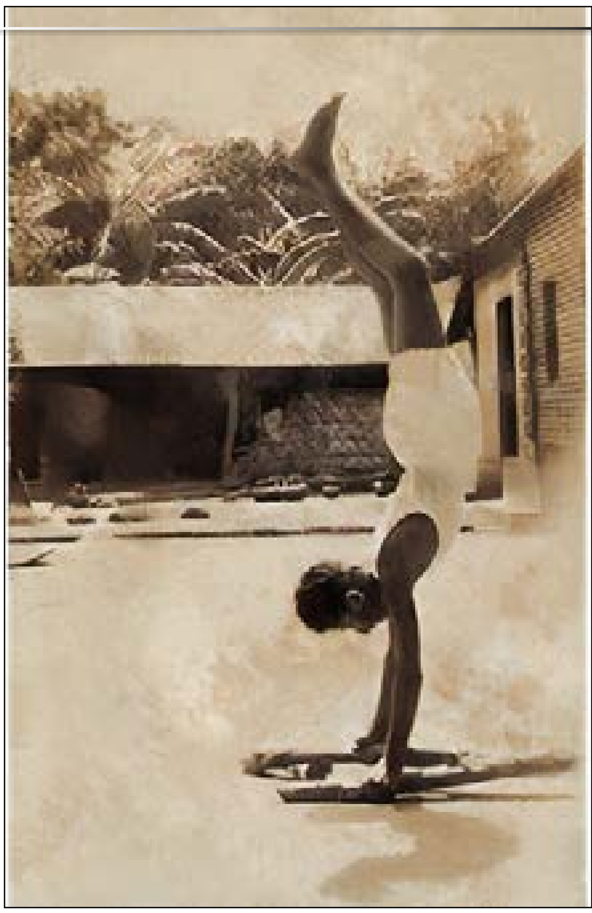

কৈশোরকাল থেকেই এমামুযযামান বিভিন্ন শারীরিক কসরতে পারদর্শী ছিলেন।

সমাজসেবা:

সমাজসেবামূলক কাজ করা ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। দেশবিভাগের অল্পদিন পর তিনি হোমিওতে 'ডক্টর অব মেডিসিন' ডিগ্রি অর্জন করেন। গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হোমিও মেডিসিন নিয়ে পড়শুনা করে মানুষকে চিকিৎসাসেবা প্রদান শুরু করেন। তিনি দরিদ্র রোগীদের থেকে কখনোই ফি নিতেন না, অসংখ্য রোগীকে তিনি নিয়মিতভাবে ফি ছাড়াই চিকিৎসা করেছেন। টাঙ্গাইলে কলেরা রোগের মহামারীর সময় অধিকাংশ মানুষ যখন ভয়ে রোগীদের কাছে যেত না, তিনি তাদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করেছেন, হাজার হাজার মানুষকে প্রতিষেধক ইনজেকশান দিয়েছেন। ১৯৬৩ সনে মা ও শিশুদের সুচিকিৎসার জন্য তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৮ সনে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সা'দত ফাউন্ডেশন।

কেন লীগ ছাড়লাম।

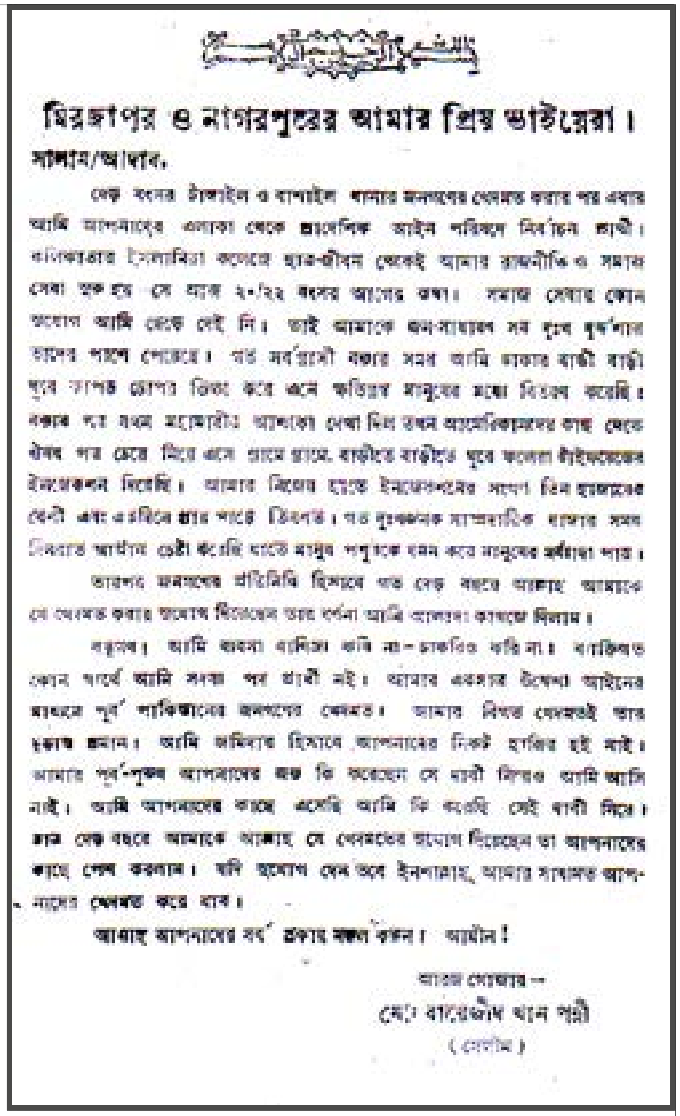

মির্জাপুর ও নাগরপুরের আমার প্রিয় ভাইয়েরা।

সালাম/আদাব.

আল্লাহ আপনাদের সর্ব প্রকার মঙ্গল করুন। আমীন!

আরজ গোজার—

মোঃ বায়েজীদ খান পন্নী

(সেলিম)

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) হিসাবে নির্বাচনী আসনের বাসিন্দাদের উদ্দেশে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা দু'টো চিঠি।

বিকাশ বাধাগ্রস্ত বিশেষ শিশুদেরকে (অটিস্টিক বা প্রতিবন্ধী) স্বাভাবিক জীবন উপহার দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এমামুযযামান এপ্রিল ১৯৯৯ সনে নিজ গ্রাম করটিয়াতে নিজ জমিতে নিজ অর্থায়নে "মুহাম্মদ সা'দৎ আলী খান পন্নী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন" নামে একটি বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নব্বইয়ের দশকে গ্রাম পর্যায়ে এমন উদ্যোগের নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। তাঁর সহধর্মীনি বেগম খাদিজা খাতুন বর্তমানে ফাউন্ডেশনটি পরিচালনা করছেন।

১৯৬৫ সনে এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী করটিয়ায় হায়দার আলী মাতৃসদন কেন্দ্র নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্যন্ত এই হাসপাতাল থেকে অগণিত মা ও শিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত হাসপাতালটি সরকারি বেসরকারি অনুদান লাভ না করায় আধুনিক চিকিৎসার জন্য গ্রামের মানুষকে কষ্ট করে জেলাসদরে বা রাজধানীতে যেতে হচ্ছে।

চিকিৎসা:

কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসাকালে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পত্নীর নিজ হাতে তোলা কবির একটি দুর্লভ ছবি

Homeo treatment for Poet Nazrul

The poet Kazi Nazrul Islam who has been admitted to the Post Graduate Hospital recently is now under the treament of a Homeopath Medical Board, according to a hospital source, reports BSS.

The Board was formed in view of the requests made by the members of the Homeopath Medical Board to the President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Members of the Board are Mr. Abdur Rahim, Secretary to the President, Mr. A. T. M. Sayed Hassain, Additional Secretary of Establishment Division, Professor Talukdar of Dacca University, Dr B.K. Pani and Dr. Nu-rul Islam (Homeopath).

The health condition of the poet is now improving, the source said.

The Bangladesh Times Aug 9.

> বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

হোমিওপ্যাথির উপর শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের জন্য সত্তরের দশকের শেষার্ধে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সায়েমের নিকট তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিএইচএমএস কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবনা পেশ করেন যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ঢাকার মিরপুর এলাকায় সরকারি হোমিও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজেও সেলিম'স ক্লিনিক নামে একটি হোমিওপ্যাথিভিত্তিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা তাঁর প্রশিক্ষিত চিকিৎসকগণের দ্বারা আজও সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে উপমহাদেশের একজন বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত ছিলেন। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত। **বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সনে কবি নজরুলের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশের ছয়জন শীর্ষ চিকিৎসককে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেছিলেন যার অন্যতম সদস্য ছিলেন এমামুয্‌যামান।**

রাজনৈতিক জীবন:

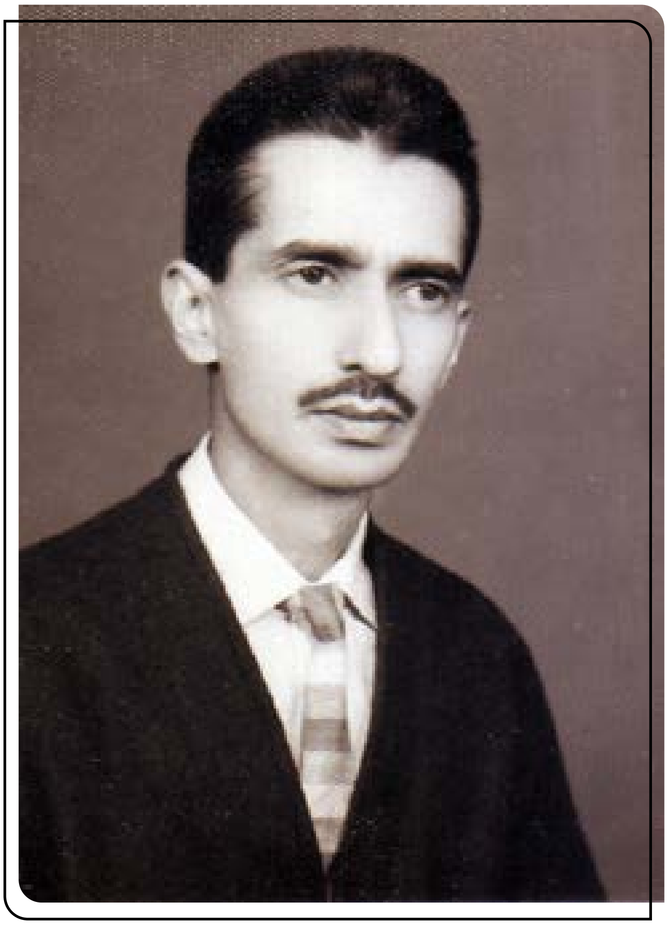

‘সেলিমের (বায়াজীদ খান পন্নী) বিপক্ষে আমি ভোট চাইতে পারব না, চাইলেও লাভ হবে না। কারণ তাঁর বিপক্ষে তোমরা কেউ জিততে পারবে না।’ – **মাওলানা ভাসানী**

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। এ সময় তিনি পুনরায় রাজনীতিতে পদার্পণ করেন।

মাননীয় এমামুয্‌যামানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের অনেকেই সে আমলে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর চাচাতো ভাই জনাব খুররম খান পন্নী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের চীপ হুইপ এবং একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। চাচাতো ভাই হুমায়ন খান পন্নী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার ছিলেন। খুররম খান পন্নীর পুত্র দ্বিতীয় ওয়াজেদ আলী খান পন্নী বাংলাদেশ সরকারের উপমন্ত্রী ছিলেন। এমামুয্‌যামানের মায়ের মামা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পর এমামুয্‌যামান আর রাজনৈতিক অঙ্গনে আসবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেও পরিবারের সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ববর্গের অনুরোধে দীর্ঘ এক যুগ পরে তিনি রাজনীতির অঙ্গনে ফিরে আসেন। **১৯৬৩** সনে টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনে অনুষ্ঠিত একটি উপনির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেকেই চেয়েছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানীকে দিয়ে ক্যাম্পেইন করাতে, কিন্তু মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, **‘সেলিমের বিপক্ষে আমি ভোট চাইতে পারব না, চাইলেও লাভ হবে না। কারণ তাঁর বিপক্ষে তোমরা কেউ জিততে পারবে না।’** বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। **বিপক্ষীয় মোট ছয়জন অভিজ্ঞ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন।**

১৯৬৩ সনে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী টাঙ্গাইল-বাসাইল আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত (এমপি) হন। এই নির্বাচনে তিনি এত বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হন যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচজন প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ছবিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীর মাঝে বিজয়ের মালা গলায় এমামুয্‌যামান।

অসামান্য ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদারক্ষা, নিঃস্বার্থ জনসেবা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঋজু অবস্থানের কারণে সর্বকনিষ্ঠ এমপি হয়েও তিনি প্রবীণ রাজনীতিকদের সমীহ অর্জন করেছিলেন। এমপি হয়ে তিনি নিজ এলাকার শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ইত্যাদি খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন করেন যার বিবরণ সরকারি গেজেটে সংরক্ষিত আছে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম-হিন্দু, বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছিল এবং অবাধে চলছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। রাজনৈতিক স্বার্থহাসিলের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আইয়ুব খান সরকার এ দাঙ্গাকে উৎসাহিত করে। এমামুয্‌যামান এমপি হয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাঙ্গাকবলিত এলাকাগুলোয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত কাজ করেন।

বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন।

শুধু তা-ই নয়, পন্নী পরিবারের অস্ত্রাগারের বহু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে পন্নী পরিবারের ভূমিকা:
বাংলার জমিনে পন্নী পরিবারের ইতিহাস ৫০০ বছর পুরনো। সুলতানিযুগ, মুঘল আমল ও ব্রিটিশ আমল সব সময়েই তাঁরা ছিলেন এ অঞ্চলের সবচাইতে প্রভাবশালী ও উদ্যোগী পরিবার। নিজ এলাকার মানুষের কাছে তাঁরা ছিলেন অভিভাবকের মতো তাদের একমাত্র নির্ভরশীলতা ও আশ্রয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন পাক হানাদার বাহিনী সারা দেশে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করল এবং গণহত্যা শুরু করল তখন এমামুয্যামানের বাবা-মা'সহ পরিবারের অনেকেই করটিয়াতে ছিলেন। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে তাদেরকে অনুরোধ করেছেন যেন তারা এই বিপদের সময় তাদের পাশে থাকেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন। পাকিস্তান আর্মি বাংলাদেশের প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে সেখানকার অর্থশালী, সম্ভ্রান্ত ও জমিদার পরিবারগুলোর উপর গিয়ে চড়াও হতো। করটিয়াতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাকবাহিনী এসে করটিয়া জমিদার বাড়িকেই তাদের ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একপ্রকার দখল করে নেয় এবং পরিবারের সবাইকে নজরবন্দী করে রাখে। এরই মধ্যে এমামুযযামান ও তাঁর বাবা পাকবাহিনীকে অনুরোধ-উপরোধ করে বহু হিন্দু ও মুসলিম গ্রামবাসীর জীবন বাঁচিয়েছেন।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর ছোট বোন আমেনা পন্নী।

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তহবিল সংগ্রহে নিউইয়র্কে যে গানের আয়োজন হয়েছিল, বিখ্যাত সেই ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন এমামুযযামানের ছোট বোন আমেনা পন্নী।

এমামুযযামানের ছোট বোন আমেনা পন্নী যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। ২৫ মার্চের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের কাহিনীর সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি সানফ্রান্সিসকো এবং আশপাশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ২৮ মার্চ তাঁরা দল বেঁধে পাকিস্তান কনস্যুলেট ভবনের সামনে বিক্ষোভ করলেন। কিন্তু পুলিশের প্রচণ্ড বাধার মুখে তারা কনস্যুলেট ভবনে ঢুকতে ব্যর্থ হন। **উপায়ান্তর না দেখে আমেনা পন্নী চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কনস্যুলেট ভবনের উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরে চলে যান এবং সামনের পতাকাদণ্ড থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলে সেখানে উড়িয়ে দেন বাংলাদেশের পতাকা।**

এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই মহীয়সী নারী ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরে এসব এলাকায় ওষুধ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য ওষুধ জোগাড় করতেন এবং লন্ডন ও ভারত হয়ে সেই ওষুধগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এসে পৌঁছাত। শুধু তাই নয়, তিনি ইংল্যান্ড-আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রায় হাজার তিনেক চিঠি লিখেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এসব অর্থ তিনি মুক্তিসংগ্রামে জড়িত ব্যক্তিদের কল্যাণে ব্যয় করেন (স্মরণীয়া-বরণীয়া- দৈনিক যায়যায়দিন, তারিখ: ১৮ মার্চ ২০১৯)। তিনি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সদস্যা ছিলেন। মেহেরুন্নেসা মেরী বিরচিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রন্থে তাঁর বীরত্বব্যাঞ্জক ভূমিকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তহবিল সংগ্রহে নিউইয়র্কে যে গানের আয়োজন হয়েছিল, বিখ্যাত সেই ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের পহেলা অগাস্টের সেই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন পপ সঙ্গীতের তৎকালীন সুপারস্টার বব ডিলান, জর্জ হ্যারিসন, এরিক ক্ল্যাপটন, রবি শঙ্কর, কমলা চক্রবর্তী, আল্লা রাখা এবং আলী আকবর খানের মত কিংবদন্তী তারকারা।

এমামুযযামানের চাচাতো ভাই মোহাম্মদ খুররম খান পন্নী ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করেছেন। (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধা কূটনীতিকের অবদান উপেক্ষিত -বাংলা নিউজ ২৪.কম, ২৫ মার্চ ২০১৮। Khurram Panni Defects to Bangladesh – The Daily Star, 13 September 2021).

সংস্কৃতিচর্চা:

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মাদ বায়াজীদ খান পন্নী চাওয়া ছিল কবি নজরুলের অমূল্য কীর্তি সংরক্ষণ ও প্রচারের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। ঢাকার মগবাজারে যে নজরুল একাডেমিটি রয়েছে সেটির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী সদস্যদের অন্যতম ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামান।

মাননীয় এমামুয্যামান মনে প্রাণে সুস্থ সংস্কৃতির ধারক ছিলেন। তাঁকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতি শনিবার রাতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচারিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের তিনি ছিলেন নিয়মিত শ্রোতা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য যে, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কুমার শচীনদেব বর্মণ, হিমাংশু দত্ত, ওস্তাদ সমরেন্দ্র পাল, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ওস্তাদ আলী আহমদ খান, পান্নালাল ঘোষ, আবদুল আলীম, ফেরদৌসী রহমান, শাহনাজ রহমত উল্লা, সোহরাব হোসেন প্রমুখ প্রতিথ যশা সঙ্গীত শিল্পীরও সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু। তিনি কবি নজরুলের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য যেমন বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তেমনি তিনি চেয়েছিলেন কবি নজরুলের অমূল্য কীর্তি সংরক্ষণ ও প্রচারের লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। ঢাকার মগবাজারে যে নজরুল একাডেমিটি রয়েছে সেটির প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী সদস্যদের অন্যতম ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামান।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিও ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। আমাদের দেশে পাকিস্তান আমল থেকেই সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে ব্যাখ্যা করার যে প্রবণতা রয়েছে এমামুয্যামান সেটার অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদী ধর্মীয় দর্শন, তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর অবস্থানকে মহত্তম শ্রদ্ধায় স্বীকার ও উল্লেখ করেছেন। বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

ব্যক্তিজীবন:

ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গোত্র মেমন বংশের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সঙ্গে মাননীয় এমামুয্যামান ৪৪ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এমামুয্যামানের শ্বশুরবাড়ি ভারতের গুজরাট রাজ্যের কাচ অঞ্চলে। ১৯৯৬ সনে প্রথম স্ত্রীর এন্তেকালের পর তিনি ১৯৯৯ সনে মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনকে বিবাহ করেন। বর্তমানে তিনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রধান উপদেষ্টা ও ইলদ্রিম মিডিয়ার চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় এমামুয্যামান দুই কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর বড় ছেলে মোহাম্মদ সা'দত আলী খান পন্নী ১৯৯৮ সনে মাত্র ২৭ বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় দুঃখজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। বড় মেয়ে উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী একজন চিকিৎসক, যিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত সেলিম'স ক্লিনিক এর পরিচালনার পাশাপাশি হেযবুত তওহীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট মেয়ে রুফায়দাহ পন্নী বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের পর নিজস্ব ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম ও ফ্যাশন হাউজ গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি হেযবুত তওহীদের নারীবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় এমামুয্যামানের ছোট ছেলে মোহাম্মদ সাইফ আল মুসান্না খান পন্নী।

বিয়ের আসরে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

সাল: ৬ জুলাই ১৯৬৯ খ্রি.

এমামুয্‌যামানের সঙ্গে সহধর্মিনী খাদিজা খাতুন ও কনিষ্ঠ সন্তান সাইফ আল মুসান্না খান পন্নী।

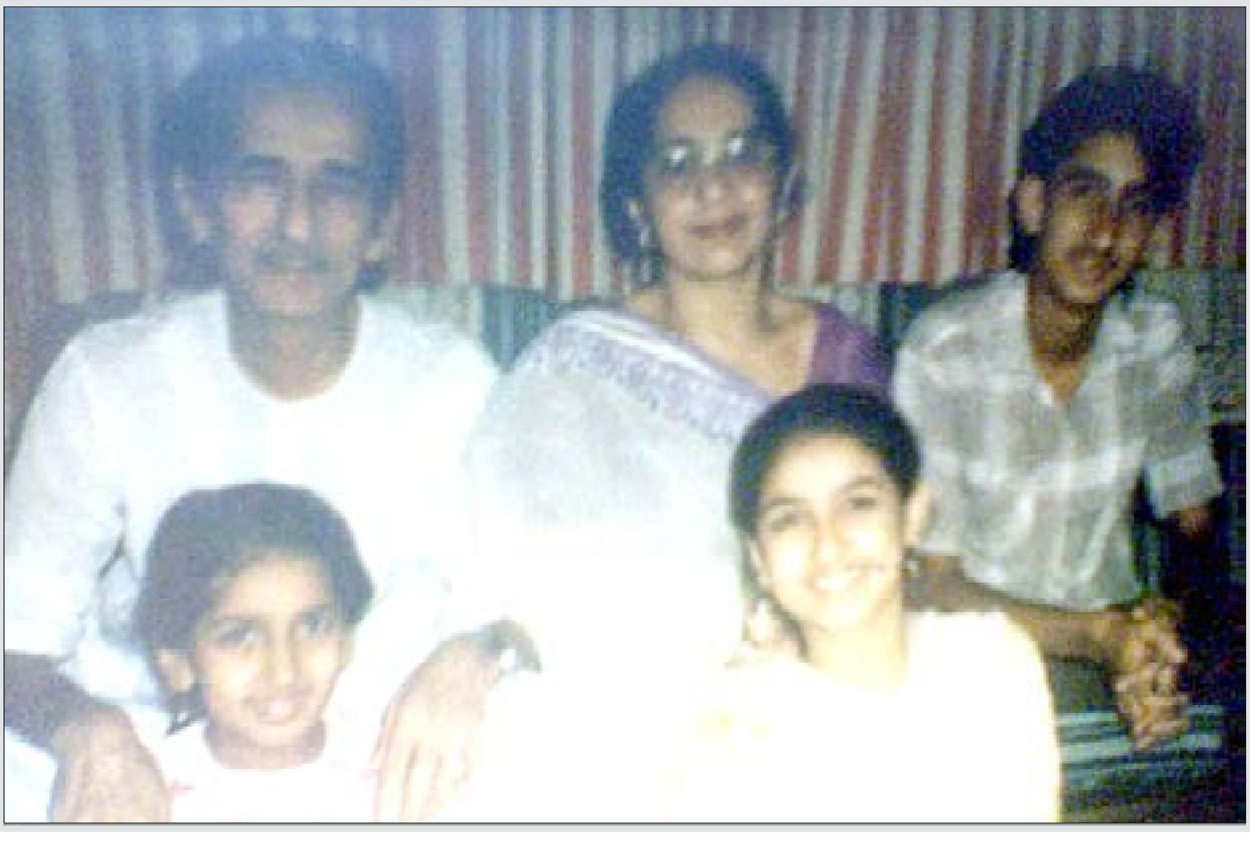

সপরিবারে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

প্রৌঢ়ত্বে এমামুয্যামান। প্রকৃত ইসলামকে তার অনাবিল রূপে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জন্য একটি বই লেখাই ছিল এ সময়ে তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

ছোটবেলা থেকেই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, জাতিতে জাতিতে হানাহানি, শোষণ পীড়নের কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি তাঁর এ প্রশ্নর উত্তর লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্রষ্টার বিধান ও নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়াই হচ্ছে পৃথিবীর অব্যবস্থাপনার, অন্যায়-অনাচার, শোষণ-পীড়নের কারণ। প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব জগতে স্রষ্টার বিধিবিধান থেকে যোজন যোজন মাইল কেবল দূরে নয় অকেবারে বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। মুসলিম নামধারী জনসংখ্যাটিও এর বাইরে নয়। তাদের কাছে অবিকৃত কোর'আন থাকা সত্ত্বেও তারা বিপরীতমুখে পরিচালিত। মানুষকে আবার স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সনে তিনি করটিয়ার দাউদ মহলে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং এই মহাসত্য প্রচারের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত ও নিজের আজীবনের শ্রমে উপার্জিত সকল সম্পদ মানবতার কল্যাণে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অকাতরে বিলিয়ে দেন।

তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত ও নিজের আজীবনের শ্রমে উপার্জিত সকল সম্পদ মানবতার কল্যাণে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অকাতরে বিলিয়ে দেন।

তিনি এমন কিছু অপ্রিয় সত্য জাতির সামনে প্রকাশ করেন যা ধর্ম দিয়ে স্বার্থ হাসিলকারী গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে। তাদের বিরোধিতার মুখে তাঁর লেখা বই "এই ইসলাম ইসলামই নয়" বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সারাদেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে উগ্রবাদী ধর্মান্ধ শ্রেণী। ফলে একাধিকবার তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ধর্মব্যবসায়ী বা জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর চোখ রাঙানিকে পরোয়া করার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি বই হচ্ছে - ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, ইসলামের প্রকৃত সালাহ, দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'! (বাংলা ও ইংরেজি), The Lost Islam, আল্লাহর মোজেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা ইত্যাদি।

আন্দোলন প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পর ২০১২ সালের ১৬ জানুয়ারি এ মহান ব্যক্তিত্ব পরলোকগমন করেন।

হেযবুত তওহীদের সদস্যদের সঙ্গে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

হেযবুত তওহীদের সূচনালগ্নে এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করছেন এমামুয্যামান।

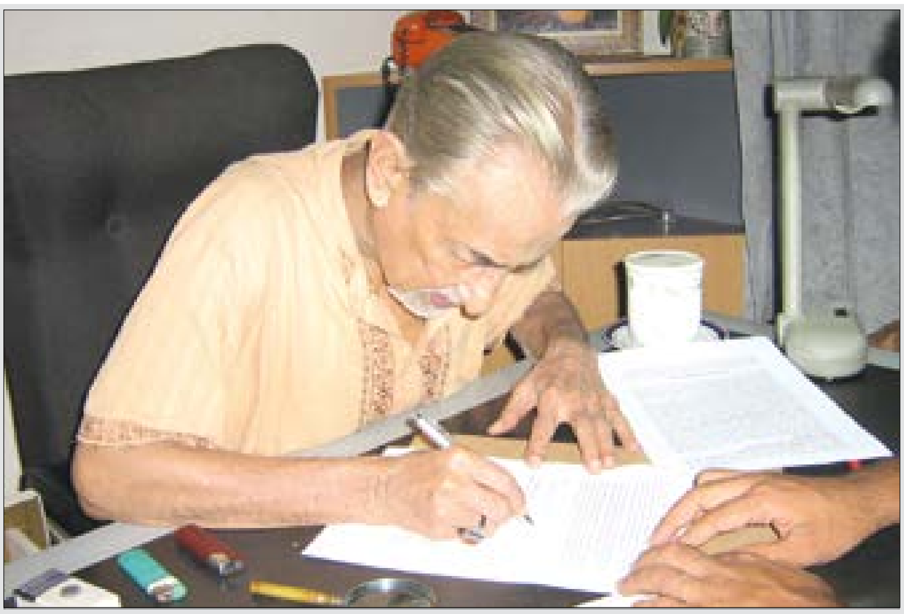

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরকারকে সহযোগিতা করার প্রস্তাবনায় স্বাক্ষর করছেন এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

আল্লাহর সংঘটিত মো'জেজার ১ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশজুড়ে আয়োজিত আলোচনা সভার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানস্থল থেকে বক্তব্য দিচ্ছেন এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।
স্থান: বনানী, ঢাকা;
তারিখ: ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

এমামুয্‌যামানের সঙ্গে হেযবুত তওহীদের দায়িত্বশীলবর্গের অভ্যন্তরীণ বৈঠক।
তারিখ: ৩ আগস্ট ২০১০;
স্থান: উত্তরা, ঢাকা।

ধর্মব্যবসায়ীদের চাপে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামানকেও অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

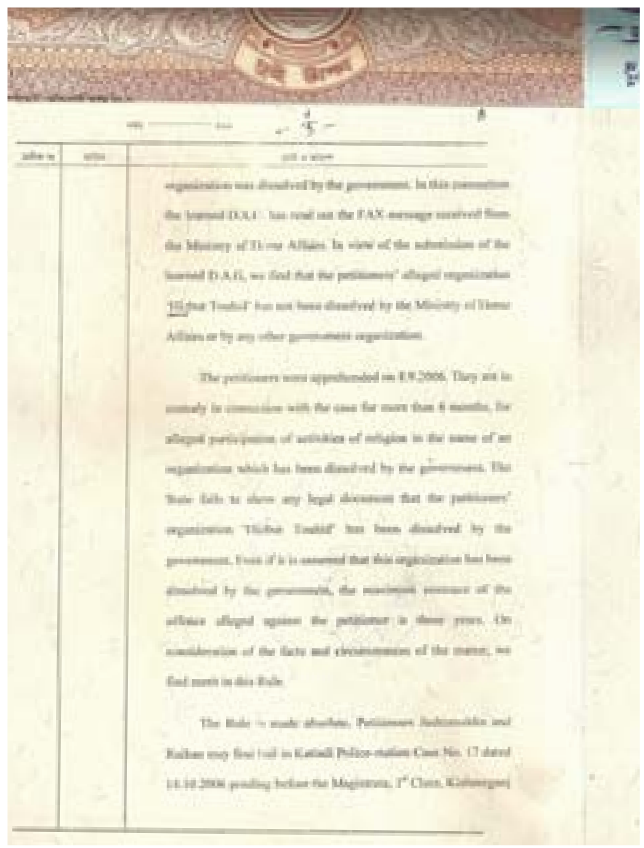

organization was dissolved by the government. In this connection the learned D.A.G. has read out the FAX message received from the Ministry of Home Affairs. In view of the submission of the learned D.A.G, we find that the petitioners' alleged organization 'Hizbut Touhid' has not been dissolved by the Ministry of Home Affairs or by any other government organization.

The petitioners were apprehended on 8.9.2006. They are in custody in connection with the case for more than 6 months, for alleged participation of activities of religion in the name of an organization which has been dissolved by the government. The State fails to show any legal document that the petitioners' organization 'Hizbut Touhid' has been dissolved by the government. Even if it is assumed that this organization has been dissolved by the government, the maximum sentence of the offence alleged against the petitioner is three years. On consideration of the facts and circumstances of the matter, we find merit in this Rule.

The Rule is made absolute. Petitioners [illegible] and [illegible] may [illegible] bail in Katiadi Police-station Case No. 17 dated 13.10.2006 pending before the Magistrate, 1st Class, Kishoreganj

"হেযবুত তওহীদ সরকারের কোনো বিভাগ থেকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি" - মর্মে উচ্চ আদালতের ফাইন্ডিং।

"হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়" - মর্মে আদালতে দাখিলকৃত পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন।

মাননীয় এমামুযযামানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হেযবুত তওহীদের বর্তমান এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

আরো কিছু ছবি

বাংলার বারো ভুঁইয়া হিসাবে পরিচিত সুলতানিযুগের প্রতাপশালী জমিদারদের মধ্যে মসনদে আলা ঈসা খাঁ ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁকে এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ সুলতান তাজ খান কররানি তুরানী দাস ব্যবসায়ীদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে কিশোরগঞ্জ-মোমেনশাহী এলাকায় অবস্থিত তাঁর পিতার জায়গীরদারী ফেরত দেন। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররানির রাজত্বকালে (১৫৭২-৭৬) ঈসা খাঁ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন অসাধারণ বীরত্বের জন্যে। মুঘল বাহিনীর কাছে দাউদ খান কররানির পরাজয়ের পর এই বারো ভুঁইয়াখ্যাত জমিদারগণ ও তাঁদের সন্তানেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আরো দীর্ঘ ৩৫ বছর যুদ্ধ চালিয়ে যান।

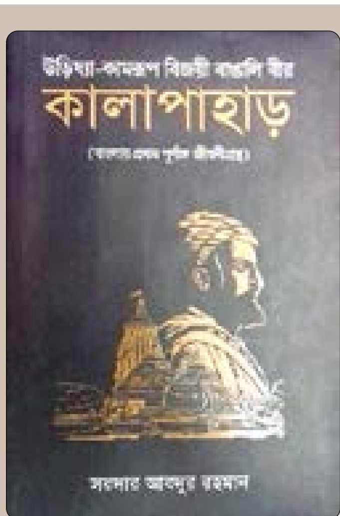

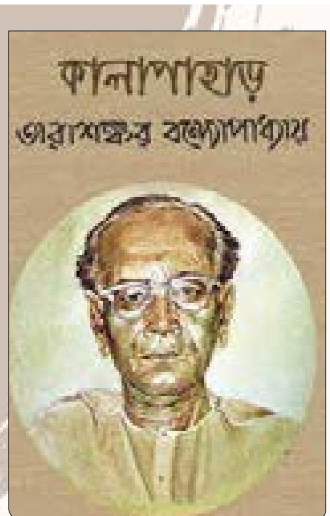

এমামুযযামানের পূর্বপুরুষ সুলতান সোলায়মান খান কররানির দুর্ধর্ষ সেনাপতি কালাপাহাড়ের (পূর্ব নাম রাজীব লোচন রায়) বীরত্বের কথা আজও মানুষের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মতো ফেরে। প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা বোঝাতে 'কালাপাহাড়ি কাণ্ড; কথাটি বাগধারায় পরিণত হয়েছে। তিনি বাংলার সীমানাকে কামরূপ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে গল্প উপন্যাস কবিতা লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, সমরেশ মজুমদারের মতো সাহিত্যিকগণ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাতেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর নামেই বৃহত্তর সিলেটের সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়ার নাম হয়েছে কালাপাহাড়।

ভারতের দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গায় অবস্থিত এমামুয্‌যামানের একজন স্বনামখ্যাত পূর্বপুরুষ সুফি সাধক হযরত সৈয়দ মুহম্মদ হোসাইনী খাজা বন্দে নেওয়াজ গেসু দরাজ (র.) এর মাজার শরিফ।

ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত পালামৌ দুর্গ। ১৬৬০ সনে বিহারের মুঘল সুবেদার দাউদ খান পন্নী রাজা মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা করায়ত্ব করেন। তিনি পুরাতন দুর্গটির সংস্কারসাধন ও পুনর্নিমাণ করেন।
(সূত্র: উইকিপিডিয়া)

১৫৫৯ সনে নওগাঁ জেলায় আফগান সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাহদুর শাহ-এর শাসনামলে নির্মিত কুসুম্বা মসজিদের বাদশাহ-ই-তখত (সুলতানের আসন)। মসজিদটি সুলতানের বিচারালয় হিসাবে ব্যবহৃত হতো।
(সূত্র: উইকিপিডিয়া)।

এমামুযযামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ১৮৭১ সনে করটিয়া জামে মসজিদটি নির্মাণ করেন যা মুঘল যুগের স্থাপত্য কীর্তির অনন্য নিদর্শন হিসাবে আজও টিকে আছে।

এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মায়ের নানা ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর জমিদারবাড়ি ধনবাড়ি প্যালেস।

ধনবাড়ি প্যালেস জামে মসজিদ। নির্মাতা এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মায়ের নানা ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)।

দাউদমহলের প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষে নিযুক্ত ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এমামুযযামানের দাদা হায়দার আলী খান পন্নী ও বাবা মেহেদি আলী খান পন্নী।

১৯০২ সালে আহসান মঞ্জিলে নবাব স্যার সলিমুল্লার সাথে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (সামনের সারিতে বা থেকে দ্বিতীয়)।

১৯২৭ সালে দার্জিলিং এর ইডেন ক্যাসেলে ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর সাথে এইচ ই লর্ড লিটন (বসা বাঁ থেকে দ্বিতীয়), গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, লর্ড ইরুইন (নবাবের পাশে), করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী, এস এম মুসাভী (দাঁড়িয়ে ডানের শেষ দু'জন)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে এমামুয্যামানের মায়ের নানা ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী।

এমামুয্যামানের মায়ের মামা নওয়াবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী (বা থেকে দ্বিতীয়) যিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ছিলেন (১৯৬১-১৯৬২)।

করটিয়ার জমিদার (বড় তরফ) ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর দৌহিত্র রাজনীতিবিদ ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নীর পুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (দ্বিতীয়) বাংলাদেশ সরকারের উপমন্ত্রী ছিলেন।

পূর্ববঙ্গবাসীর স্বার্থ আদায়ে বিশ শতকের গোড়ার দিকে যিনি নেতৃত্বের হাল ধরেন, তিনি হলেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)। এমামুযযামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ও তাঁর কনিষ্ঠ স্ত্রী তুর্কী সাম্রাজ্যের একজন রাজকন্যা আয়েশা খানমের কন্যা রওশন আরা খানমের সঙ্গে স্যার সলিমুল্লাহ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রীর বড় ভাই ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সঙ্গে তিনি এদেশের শিক্ষাবিস্তারে একযোগে কাজ করেছেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, আজিমপুরের ইসলামিয়া এতিমখানা, বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি ও অবদান জড়িয়ে আছে।

আহসান মঞ্জিল। এটি ছিল ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারির সদর কাচারি।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম ইয়াতিমখানা। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৯ সালে এ অনাথ আশ্রমের সূচনা করেন।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর দাদার বড় ভাই আটিয়ার চাঁদ ও দানবীর খ্যাত ওয়াজেদ আলী খান পন্নী কর্তৃক ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত করটিয়া সা'দত কলেজ। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ এটি (ডানে), ১৯২৫ রোকেয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসাটিও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি (বামে)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলটি তাঁরই অবদান ও স্মৃতি বহন করছে।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনটি এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মায়ের নানা ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯২৯) স্মৃতি বহন করছে।

১৯০৩ সালে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এখানে প্রসূতি ও মহিলা বিভাগ স্থাপনের জন্য অনুদান দেন। ১৯৬৩ সালে কলেজের নাম পরিবর্তন করে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নামে নবাবদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ করা হয়।

যৌবনে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর দাদাজান মাহবুবে খোদা হায়দার আলী খান পন্নী (রহ.)।

করটিয়া জমিদার বাড়ির বড় তরফের মাসুদ মঞ্জিল। প্রতিষ্ঠাতা করটিয়ার স্বনামখ্যাত জমিদার, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশে মুসলিম রেনেসাঁর পথিকৃৎ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া সাহেব।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথিতযশা কবি, লেখিকা ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম সুফিয়া কামাল ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন এমামুয্যামান জনাব বায়াজীদ খান পন্নীর দাদীর ভাইয়ের স্ত্রী অর্থাৎ দাদী। ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ “মন ও জীবন” এর প্রকাশক ছিলেন এমামুয্যামান নিজেই। আর কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসক ছিলেন এমামুয্যামান।

দাউদ মহলে গ্রামের মানুষের দ্বারা অভ্যর্থিত এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

করটিয়া জমিদারবাড়ির দাউদ মহলের চত্বরে আয়োজিত ক্রীড়া অনুষ্ঠানে গ্রামীণ খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য প্রদর্শনী উপভোগ করছেন এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ও তাঁর বড় ছেলে মোহাম্মদ সা'দত আলী খান পন্নী।

হুমায়ুন খান পন্নী

এমামুয্যামানের চাচাতো ভাই হুমায়ুন খান পন্নী ১৯৬৩ সনে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তান আমলে শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ১৯৯১ সনে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংসদে তিনি ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন।

মুসলিম নারীদেরকে ধর্মের নামে দমিয়ে রাখার বিরুদ্ধে যে মহিয়সী নারী তাঁর ক্ষুরধার লেখনির দ্বারা অমর হয়ে আছেন তিনি বেগম রোকেয়া। তিনি পন্নী পরিবারের সঙ্গে নিবীড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

এমামুয্যামানের দাদাজান মাহবুবে খোদা হায়দার আলী খান পন্নীর (রহ.) সাথে বাবা মেহেদী আলী খান পন্নী (সর্বডানে)।

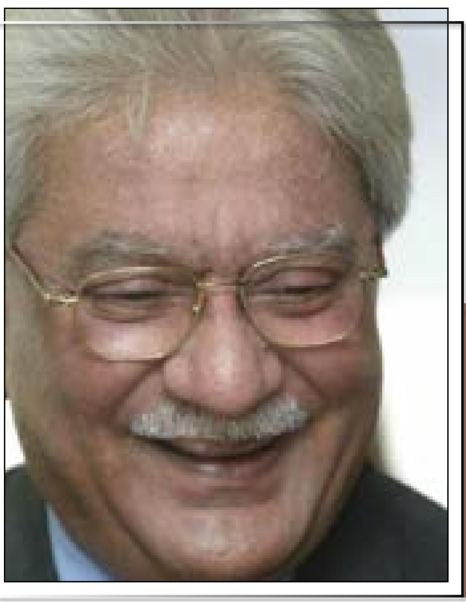

করটিয়ার জমিদার (বড় তরফ) ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর দৌহিত্র রাজনীতিবিদ ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নীর পুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (দ্বিতীয়) বাংলাদেশ সরকারের উপমন্ত্রী ছিলেন।

আতিয়ার জঙ্গলে বুনো মহিষ শিকারের পর এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর শ্রদ্ধেয় দাদাজান সুফি সাধক মাহবুবে খোদা হায়দার আলী খান পন্নী (রহ.)।

১৯২৭ সালে করটিয়ার নিজ বাড়ি থেকে শিকারের জন্য রওনা হচ্ছেন এমামুয্‌যামানের পিতা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী।

১৯৩৪ সালে গড়াই নদীতে করটিয়ার জমিদার পরিবার তাদের বোট "সুলতানে"। এই নৌযানে চড়েই ভ্রমণ করতেন এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। এমামুয্‌যামানের ডাক নাম "সুলতান" থেকেই বোটটির নামকরণ করা হয়।

নিজের শিকার করা চিতাবাঘের সঙ্গে এমামুয্যামানের বাবা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী।

তরফপুরের জঙ্গল থেকে একটি মানুষখেকো বাঘ শিকারের পর এমামুয্যামানের বাবা মেহেদী আলী খান পন্নী ও দাদাজান সুফি সাধক মাহবুবে খোদা হায়দার আলী খান পন্নী (রহ.)।

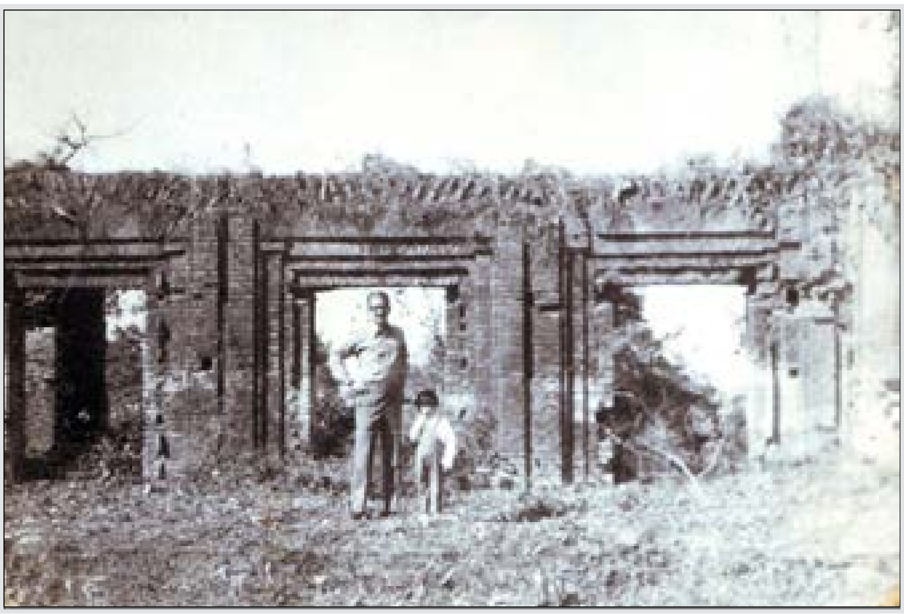

গোড়াইতে পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্নের সামনে এমামুয্যামান। বর্তমানে এই ভবনটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথচ এককালে এই গোড়াইতে বসেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তাঁর পূর্বপরুষরা।

পন্নী পরিবারের পোষা হাতি মহারানি ও মন্থরা যেগুলোতে চড়ে তাঁরা শিকারে যেতেন।

পোষা চিতাবাঘের সঙ্গে এমামুয্‌যামানের বাবা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর বাবা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী।

বৃটিশ আমলে নিজেদের ব্যবহৃত গাড়ির সামনে তরুণ বয়সে এমামুয্যামানের বাবা জনাব মেহেদী আলী খান পন্নী (বাঁ পাশে)।

এমামুয্‌যামানের পিতা করটিয়ার জমিদার জনাব মেহেদী আলী খান পন্নীর ফোটোগ্রাফের সঙ্গে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

করটিয়ার জমিদার বাবা মেহেদী আলী খান পন্নীর সাথে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

করটিয়ার জমিদার বাবা মেহেদী আলী খান পন্নীর সাথে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

পিতা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী, সহধর্মিণী বেগম মরিয়ম সাত্তার ও স্বজনদের
সাথে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

নিজ গাড়ির ড্রাইভিং
সিটে এমামুয্‌যামান
জনাব মোহাম্মদ
বায়াজীদ খান পন্নী।

মাননীয় এমামুয্যামানের পিতৃ নিবাস করটিয়া জমিদার বাড়ির দাউদ মহল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি এই ওয়াকফ এস্টেটের মোতয়াল্লি নিযুক্ত হন।

১৯৫০ খ্রি.

পাঁচ বোনের সঙ্গে এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

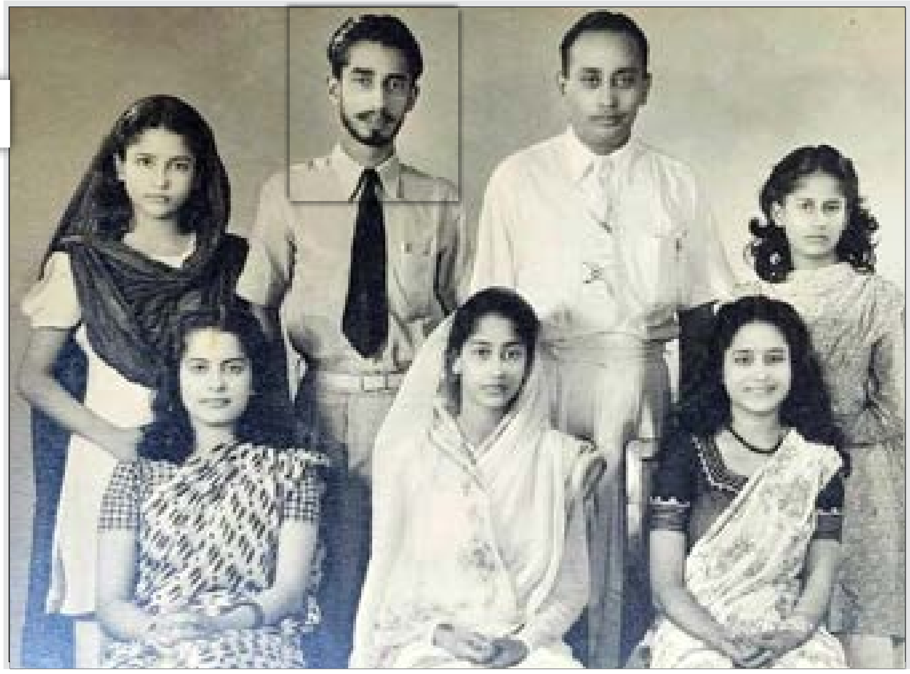

পাঁচ বোনের সঙ্গে এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

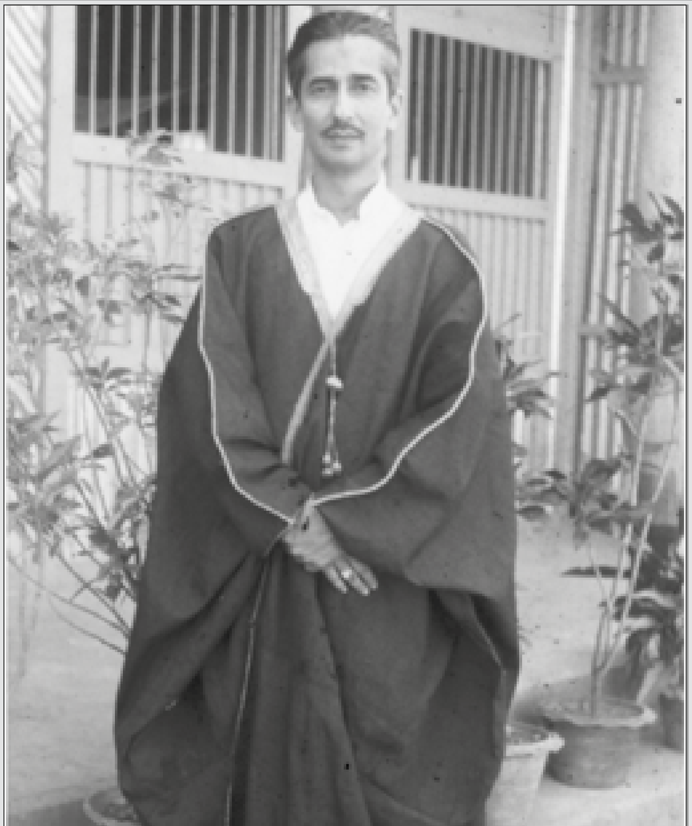

অভিজাত আরবীয় পোশাকে
এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

দাউদ মহলের বারান্দায় একজন অতিথির সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন এমামুয্‌যামানের বাবা মেহেদী আলী খান পন্নী।

পোষা লেপার্ড (চিতাবাঘ) বিউটির সাথে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মাদ বায়াজীদ খান পন্নী

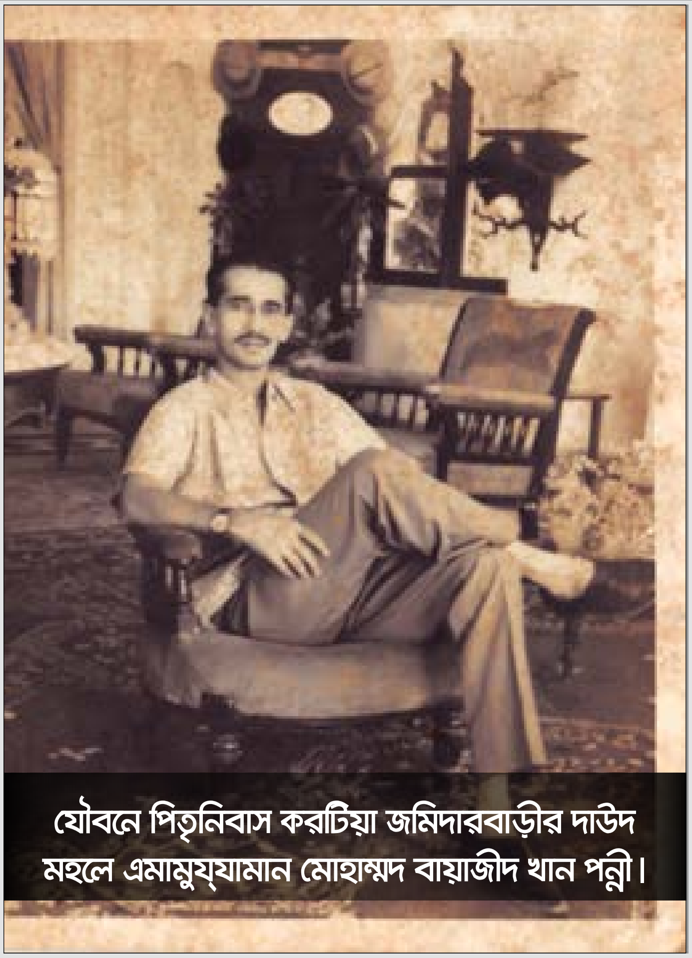

যৌবনে পিতৃনিবাস করটিয়া জমিদারবাড়ীর দাউদ মহলে এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

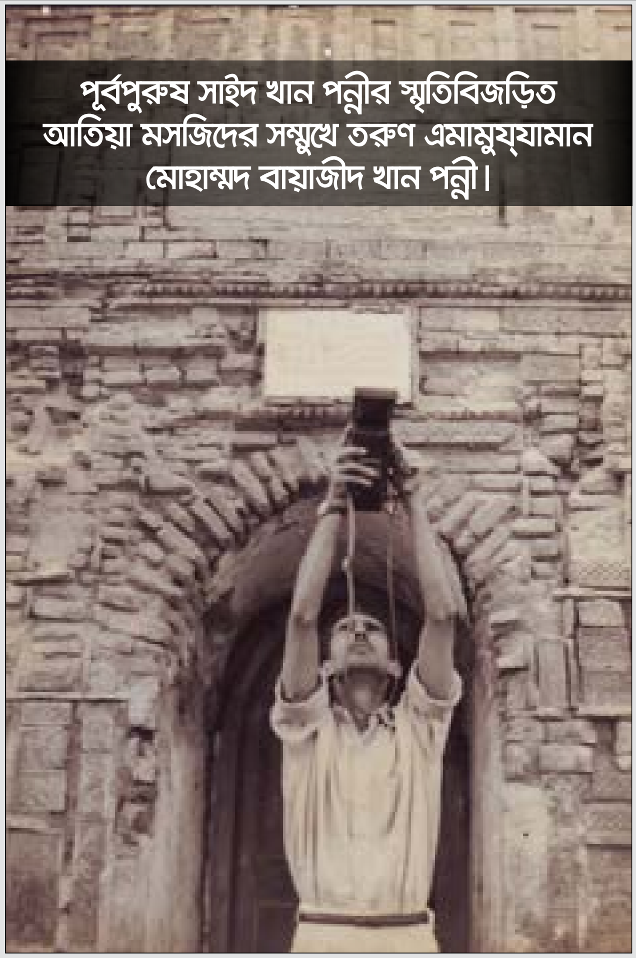

পূর্বপুরুষ সাইদ খান পন্নীর স্মৃতিবিজড়িত আতিয়া মসজিদের সম্মুখে তরুণ এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

যুবক বয়সে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

দাউদ মহলে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ও সহধর্মিণী
বেগম মরিয়ম সাত্তার।

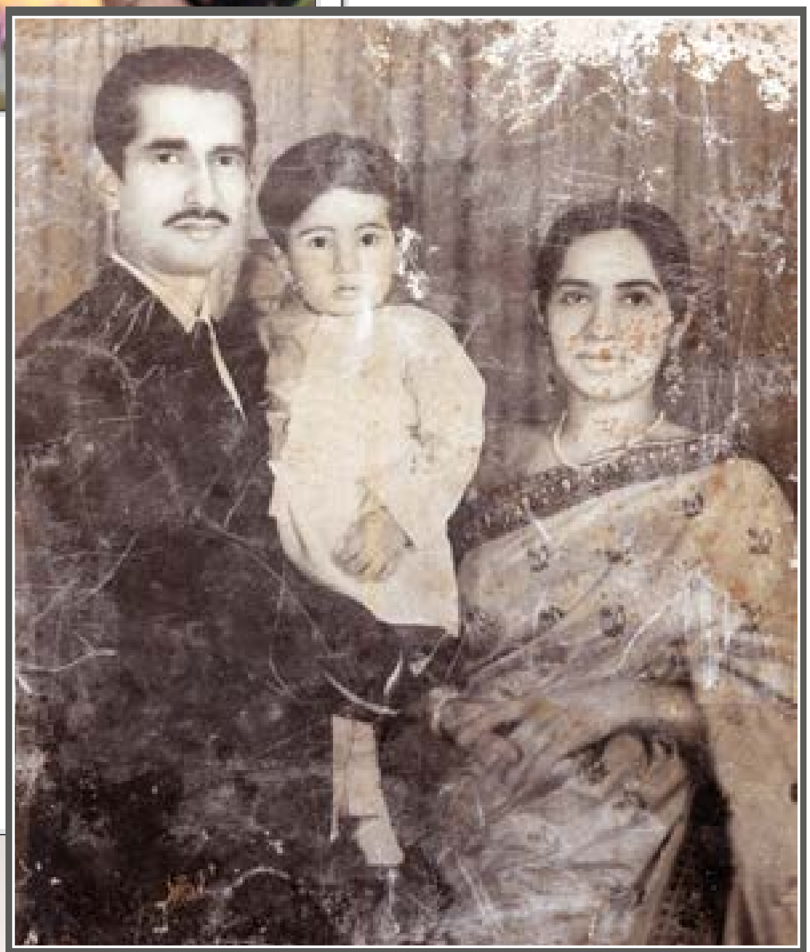

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ও সহধর্মিণী বেগম মরিয়ম সাত্তার। কোলে বড় ছেলে মোহাম্মদ সা'দত আলী খান পন্নী।

মাননীয় এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সঙ্গে ছোট বোন সেলিনা দোজা পন্নী ও ভগ্নিপতি সৈয়দ আনোয়ার-উদ-দোজা।

পিতা করটিয়ার জমিদার মেহেদী আলী খান পন্নী ও ভাই দাউদ খান পন্নীর সাথে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী।

দাউদ মহলে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ও তাঁর বড় ছেলে মোহাম্মদ সা'দত আলী খান পন্নী।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর বড় ছেলে মোহাম্মদ সা'দত আলী খান পন্নী (১৯৭০-১৯৯৮) যিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন।

১৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মাননীয় এমামুয্যামান পরলোকগমন করেন। হেযবুত তওহীদের শত শত সদস্য তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক জনপদ আতিয়ার প্রশাসক সাঈদ খান পন্নী

-ওমর খান পন্নী

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর একজন সম্মানিত পূর্বপুরুষ ছিলেন আতিয়া পরগনার সুবেদার সাঈদ খান পন্নী। মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন আতিয়া মসজিদ (নির্মাণ ১৬১০) তাঁর স্মৃতি বহন করছে। মসজিদটির ছবি দশ টাকার নোটে চিত্রিত ছিল।

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের 'আতিয়া' ছিল এক সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাঈদ খান পন্নী শাসনভার নেওয়ার পূর্বে অত্র এলাকা 'আতিয়া' নামে পরিচিত ছিল বলে মনে হয়। ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলী শাহানশাহ্ বাবা আদম কাশ্মির (র.) আতিয়ায় (যদিও তখনও আতিয়া নামে পরিচিত হয় নি) খানকা নির্মাণের পূর্ব হতে উক্ত এলাকা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল বলে ধারণা করা হয়। হযরত আলী শাহানশাহ্ আদম কাশ্মিরি (র.) তার খানকা কোহেস্থানে ঢাকার উঁচু গড়ারণ্য ভূমিতে স্থাপন না করে (সাধারণত উঁচু আরণ্যক ভূমিতে পীর, দরবেশ, বুজুর্গদের কিংবা ইসলাম প্রচারকদের আদর্শ স্থান বলে গণ্য করা হয়) পার্শ্ববর্তী সিকস্তী নামক নদীর তীরে তাঁর খানকা বা আস্তানা স্থাপন করলেন। এতে প্রতীয়মান হয় তাঁর খানকা স্থাপনের পূর্ব হতে ঐ এলাকা এক সমৃদ্ধ জনপদে বিস্তৃত ছিল। তিনি সমৃদ্ধ জনপদকেই তাঁর আস্তানা বা খানকা নির্মাণের জন্য নির্বাচন করলেন। তারপর থেকেই সেস্থানে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল। এই খানকাকেন্দ্রীক এলাকা এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, ১৪ শতকের পর থেকে উত্তর ভারত হতে মোয়াজ্জমাবাদ ও সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁও) এলাকাদুটির যাতায়াতের রাস্তা স্থল ও

নদী পথে প্রশস্ত হয়েছিল।

স্থল পথে প্লাইস্টোসিন যুগের উঁচু ভূমি- ঘোড়াঘাট (রংপুর), মধুপুর, আলেপসিংহ, ভাওয়াল থেকে সাভার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আবার নদী পথে সোনারগাঁও ও ভাটি অঞ্চলে যাতায়াতের নদীপথ হিসেবে প্রাচীন গঙ্গা ব্যবহৃত হতো। ১৪৯৮ খ্রি. হোসেন শাহ্ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত শাহ হোসেন ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে নৌপথে মোয়াজ্জবাদ পৌঁছাতে অসুস্থতাবশত যাত্রাবিরতি করেন। অনেকে মনে করেন হযরত আলী শাহানশাহ বাবা আদশ কাশ্মির (র.) এর মাজার খানকাতেই অবস্থান নিয়েছিলেন। বাংলার সুলতান মাহমুদ নৌপথে ভাটি অঞ্চল অভিমুখে যাত্রাকালে বাবা কাশ্মির (র.) এর মাজার খানকাতেই যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং পুত্রশোকে মৃত্যুবরণ করেন। শাহানশাহ্ আলী বাবা কাশ্মির (র.) মাজারের পাশে যে কবরের অবস্থান, সেটাই সুলতান মাহমুদের কবর বলে অনেকে মনে করেন। সুলতানিআমলের আরেকটা মসজিদ সেখানে ছিল যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

বর্তমান আতিয়ার পাশে হিঙ্গানগরে রাজা ছিল কংস নারায়ণ। কংস নারায়ণের ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের সংস্কার হলে হোসেন শাহী সালতানাতের কসবা নগরী অর্থাৎ 'দুর্গযুক্ত' নগরীর মর্যাদা লাভ করে। সাঈদ খান পন্নীর দাদা গৌড়ের সুলতান সুশাসক বিচক্ষণ দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক সোলায়মান খান কররানি বা পন্নী (এই বংশের সন্তানগণ কখনও কররানি, কখনও পন্নী উপাধি গ্রহণ করেছেন (তথ্যসূত্র: সাওলাতে আফগানী এবং খান পন্নীদের কুরছিনামা)। ১৫৬৪ খ্রি. সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র বায়েজীদ খান পন্নীকে পূর্বাঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে আলী শাহানশাহ বাবা আদম কাশ্মির (র.) এর মাজারকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ জনপদে পাঠিয়ে দেন। তিনি যে স্থানে প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপন করেন সে স্থানের নাম দেন বায়েজীদ নগর যা বর্তমানে টাঙ্গাইলের বাজিতপুর নামে পরিচিত। বায়েজীদ খান পন্নীর পিতা সোলামান খান কররানি ১৫৬৭ খ্রি. উড়িষ্যা এবং কামরূপের নিম্নাঞ্চল হয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনিক দপ্তর বায়েজীদ নগর অভিমুখে যাত্রা করে ঘাটাইলের

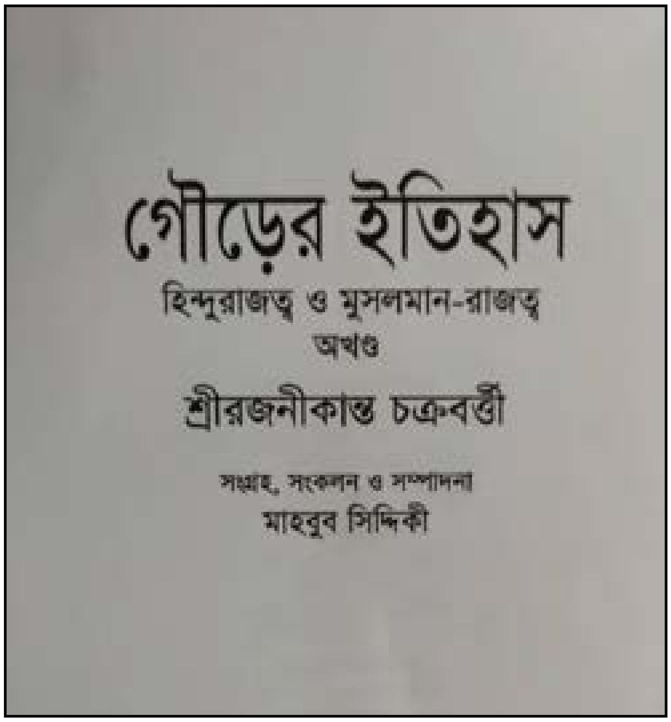

গোপিনপুরে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। ধরে নেওয়া যায় তিনি বায়েজীদ নগরে আসার পথে ঘাটাইলে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। সুলতান সোলায়মান খান কররানি ঘাটাইলের যে স্থানে তাবু গেড়েছিলেন উক্ত স্থানটি 'কররানি চালা' (বিকৃতিতে কেরানীর চালা) নামে আজও সেই ঘটনার অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে চলেছে।

১৫৭২ সনের দিকে বৃদ্ধ অসুস্থ পিতা সোলামান খান কররানি বা পন্নীর আহ্বানে বায়েজীদ খান পন্নী, তার স্ত্রী ও পুত্র সাঈদ খান পন্নীকে বায়েজীদপুর প্রাসাদে রেখে রাজধানী গৌড়ে গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে ভগ্নিপতি হারসু কর্তৃক নিহত হন। তৎপর সোলামান খান কররানির দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খান কররানি ১৫৭২ খ্রি. গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতার অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে বাদশাহ আকবরের সঙ্গে সকল প্রকার মিত্রতামূলক সন্ধি চুক্তি বাতিল করে গৌড় রাজ্যকে (বাংলা বিহার) সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন (রিয়াজুস সালেহীন ও আবরনামা)। এতে বাদশাহ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার পর ১৫৭৬ খ্রি. ১২ জুলাই রাজমহলের এক ভীষণ যুদ্ধে

রূপসী গ্রামে সাঈদ খান পন্নীর কথিত বাড়ি।

সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় দাউদ খান পন্নী নিহত হন। কররানি রাজ্যের পতন হলে বায়েজীদ নগরে অবস্থানরত সাঈদ খান পন্নী সিংহাসন পুনরুদ্ধারে গোপনে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে থাকেন।
বাদশাহ আকবর সাঈদ খান পন্নীকে গ্রেফতার করার জন্য সেনাপতি দেলদুয়ার খাঁর নেতৃত্বে বায়েজীদ নগরে সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে সাঈদ খান পন্নীর পীর গুরু মস্তান শাহ যিনি বাবা আদম কাশ্মির (র.) এর শিষ্য ছিলেন বলে কথিত, তিনি শিষ্য সাঈদ খান পন্নীকে অসম যুদ্ধ থেকে বিরত রেখে বায়েজীদ নগর প্রাসাদ থেকে পালিয়ে আত্মগোপনে থাকতে বলেন। মুঘল বাহিনী বায়েজীদ নগর আক্রমণ করে কামানের গোলার আঘাতে বায়েজীদ নগর প্রাসাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। সাঈদ খান পন্নী বায়েজীদ নগর দেলদুয়ারের রূপসী গ্রামে এবং কাশ্মির (র.) এর মাজার কেন্দ্রীক এলাকায় বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন।

তারপর গুরু মস্তান শাহ শিষ্য সাঈদ খান পন্নীকে নিয়ে ফতেহপুর সিক্রি বাদশহ আকবরের পীর সেলিম শাহ চিশতীর দরবারে রেখে আসেন। কিছুদিন পর বাদশাহ আকবর সাঈদ খান পন্নীর পরিচয় পেয়ে আদর স্নেহে তাকে দিল্লীর রাজদরবারে নিয়ে যান। কিছুদিন অবস্থানের পর নজরবন্দীতে থাকা তারই চাচাত বোন দলিয়া বেগমের সাথে বিয়ে দিয়ে ১৬০০ খ্রি. সরকার বাজুহা (ময়মনসিংহ) ও সরকার ঘোড়াঘাটের (রংপুর) খেলাত দিয়ে ৩০০ শত তংকা (টাকা) মাসোহারা ধার্য করে সস্ত্রীক তার পিতার প্রশাসনিক কেন্দ্র বায়েজীদ নগরে পুনরায় ফিরে এসে মুঘল আক্রমণে প্রাসাদের বিধ্বস্ত বিবর্ণ চেহারা দেখে বসবাসের অযোগ্য মনে করেন; কোহেস্থানে ঢাকা গড় পাহাড় অঞ্চল বনে জঙ্গলে পূর্ণ থাকায় তাও বাসস্থানের অযোগ্য মনে করেন; হিংগানগরেও মনপুত হল না। পরিশেষে শাহ আলী শাহানশাহ বাবা আদম কাশ্মির (র.) এর মাজার কেন্দ্রীক এলাকায় বাসস্থান নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাঈদ খান পন্নীর প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্তির পর আতিয়ার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। গুরু মস্তান শাহর নির্দেশে সাঈদ খান পন্নী ১৬০৯ খ্রি. এক সুরমস্য মসজিদ নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে মুঘল স্থাপত্যে গড়া এ মসজিদ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ইট সংগ্রহ করা হয়েছে বগুড়ার মহাস্থানগড় হতে। দিল্লীর প্রসিদ্ধ স্থপতি মোহাম্মদ খাঁ সুদূর দিল্লী হতে আতিয়ায় এসে মসজিদ নির্মাণ কাজে তদারকি করেন। লক্ষ করার বিষয় মসজিদ নির্মাণে স্থপতি এসেছিলেন ভারতবর্ষের রাজধানী সুদূর দিল্লী থেকে। কোন স্থানের রাজনৈতিক গুরুত্ব সমৃদ্ধ জনপদ না থাকলে সুদূর দিল্লী হতে কোন প্রসিদ্ধ রাজকীয় স্থপতি মসজিদ নির্মাণ তদারকি করতে আতিয়ায় আসার কথা নয়।

সাঈদ খান পন্নীর বর্ণাঢ্য শাসনামলে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এক জাঁকজমক ও শান্তিপূর্ণ ন্যায় বিচারিক সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়। পেশাজীবীদের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। দূরদূরাঞ্চল হতে বড় বড় পালতোলা, গুনটানা, দাঁড়টানা, বজরা বাণিজ্য নৌকা সন্তোষপুর বন্দরে নোঙর করে পণ্য কেনাবেচা করত। মসজিদ নির্মিত হবার পর তিনি মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন। প্রতিদিন অনেক মুসাফির উক্ত খানায় যাত্রা বিরতি করতেন। এই মুসাফিরখানার সুখ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই ছিল। বিখ্যাত 'আকবরনামা' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। তিনি আলী কাশ্মির (র.) এর মাজারের ব্যয় নির্বাহের জন্য লৌহজঙ্গচর ও চেরাহী নামে দুইটি মহল দান করেন।

সাঈদ খান পন্নীর সুশাসন ও অনবদ্য দানশীলতার কথা চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোত্রের, ধর্মের লোক বিক্রমপুর, যশোর, ফাতোয়াবাদ ও বরেন্দ্র হতে লোকজন এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। দেখতে দেখতে আতিয়া ঘনবসতিতে পূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর উদার নীতির প্রেক্ষিতে বহুলোক নিষ্কর, লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর, দেবত্তর, মহত্র, পীরপাল মদনবাঁশ ব্যবস্থার নামে ভূমি বরাদ্দ পায়।

এছাড়া নাগরিকদের সুখ শান্তির জন্য জমির ফসলের এক-পঞ্চমাংশ দানের পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতিকে 'সরকমি' বলা হত। ঐতিহাসিক জনপদ আতিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে সাঈদ খান পন্নীর ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন সুশাসক, ধর্মভীরু, ন্যায় বিচারক, জনকল্যানমুখী ও ব্যক্তিগতভাবে মানবীয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। আতিয়া মসজিদের চারশত বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'আতিয়ানামা'-তে প্রকাশিত শ্রী রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ বাবু কর্তৃক ৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রচিত 'সাঈদ খাঁ' উপন্যাসের আলোকে মীর খালেদ হোসেন যথার্থই লিখেছেন- "আমাদের জাতিসত্তার শেকড় সন্ধানে সাঈদ খান পন্নীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখতে পাই। ধর্মভীরু, উদার, অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী সাঈদ খান পন্নী এক আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁকে নিয়ে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত হতে পারে কালজয়ী রচনা। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে ফেরানো দরকার"।

উল্লেখ্য যে, ১৬০০ শতকে সাঈদ খান পন্নী বাদশাহ আকবরের খেলাফত নিয়ে আতিয়া নামক সমৃদ্ধ জনপদে পুনঃপদার্পণ করেন। আতিয়া পরগনা বা মহল নামে পরিচিত ছিল বলে মনে হয় না। যদি ১৬০০ শতকের পূর্বে আতিয়া নামক কোন পরগনা বা মহলের অস্তিত্ব থাকত তবে ১৫৯৯ সালে রচিত বিখ্যাত 'আকবরনামা' গ্রন্থে এবং ১৫৮২ খ্রি. রচিত তোদরমল্ল নির্ভরযোগ্য রাজস্ব তালিকায় অন্যান্য মহলের তালিকার সঙ্গে আতিয়া নামে পরগনা বা মহলের নামও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকত। কিন্তু তোদরমল্লের রাজস্ব তালিকা এবং আকবরনামা গ্রন্থে আতিয়া নামে কোন পরগনা বা মহলের উল্লেখ নাই। আকবরনামায় শুধু ১৬০১ খ্রি. মুসা খানের সঙ্গে সুবেদার মানসিংহের একটি যুদ্ধকে আতিয়ার যুদ্ধ বলে উল্লেখ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু শেরপুর আতিয়া যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হয়েছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। উক্ত যুদ্ধে সাঈদ খান পন্নী অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। যুদ্ধে সাঈদ খান পন্নীর বীরত্বের জন্য মানসিংহের সুপারিশে সম্রাট আকবর সাঈদ খান পন্নীকে পরগনা দান করেন বলে উল্লেখ আছে। উক্ত শেরপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল

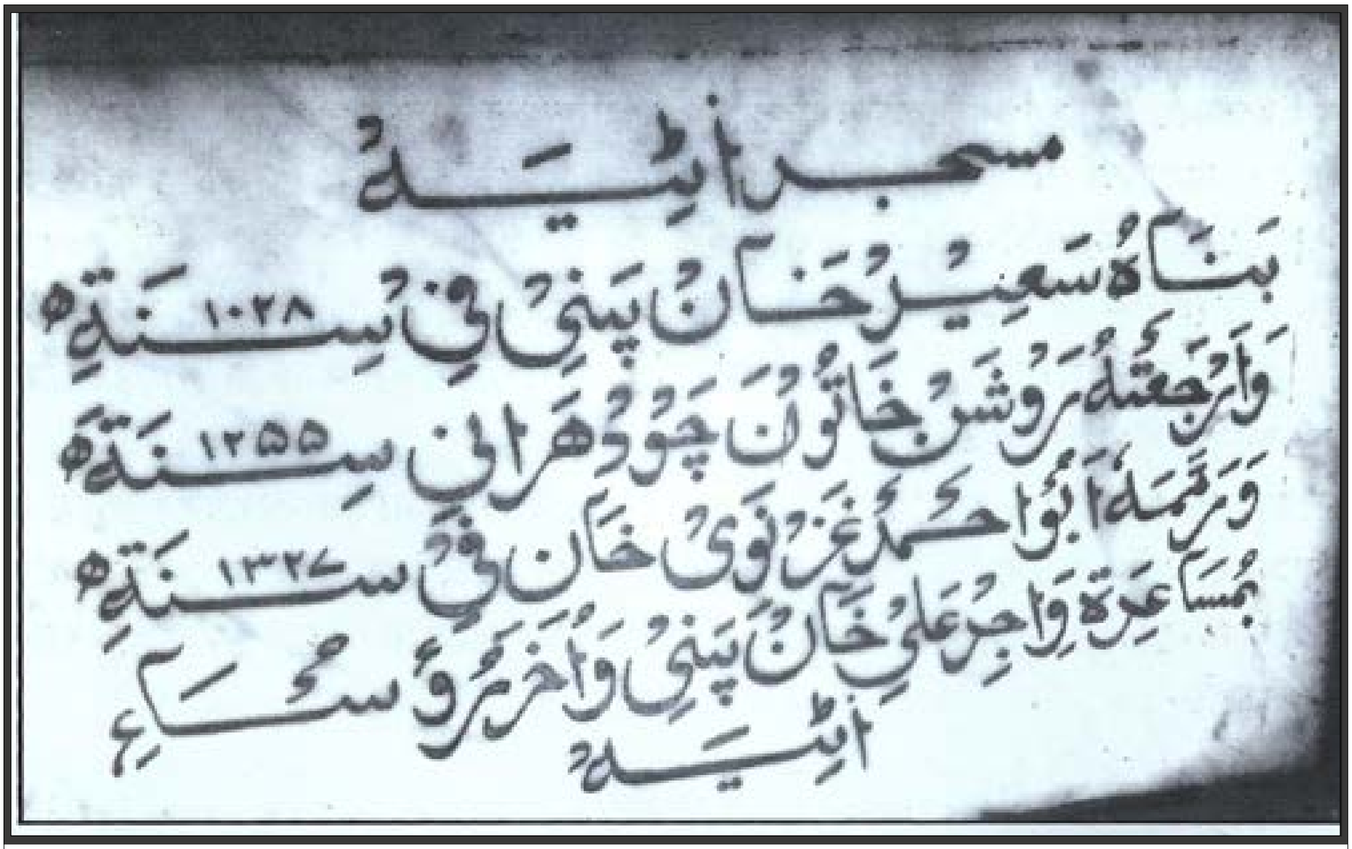

আতিয়া মসজিদের দেয়ালে ফারসি ভাষায় প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারদের নাম লিপিবদ্ধ।

১৬০১ খ্রিঃ। আকবর কর্তৃক সাঈদ খান পন্নীকে ১৬০০ খ্রিঃ উক্ত পরগণা আতা বা দান করার ১ বছর পর সে এলাকায় সংঘটিত কোনো যুদ্ধের বর্ণনায় আতিয়া নাম উল্লেখ থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

যতদূর জানা যায় আতিয়া নামে পরগনার উদ্ভব হয়েছে ১৫৭৬ খ্রিঃ রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান পন্নীর পরাজয়ের আনুমানিক ২৪ বছর পর ১৬০০ সনে। এ সময় সাঈদ খান পন্নী বাদশাহ আকবর কর্তৃক ঘোড়াঘাট (রংপুর) সরকার বাজুহার (ময়মনসিংহ) পরগনা আতা বা দান হিসেবে পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাদশাহ্ আওরাঙ্গজেবের আমলে জারিকৃত দানসংক্রান্ত সনদের ফরমানটি আতিয়ানামা নামেই স্বীকৃত। তাই বলা যায়, আতিয়া নামের পরগণার আতা বা দান করার পর। সেই ফার্সী শব্দ 'আতা' বা দান থেকেই আতিয়া নামে নতুন পরগণার উদ্ভব ঘটেছিল বলে সমধিক যুক্তিযুক্ত।

সাঈদ খান পন্নীর পুত্র ফতেহ খান পন্নী তৎপুত্র সেলিম খান পন্নী এবং মাঈন খান পন্নী পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আতিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তার প্রমাণ হলো বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময় দিল্লীর দরবার হতে ফার্সী ভাষায় সনদের ফরমান আতিয়া নামেই মোজাফ্ফর খান পন্নী ও মঈন খান পন্নীর নিকট পাঠানো হয়। সে সনদের ফরমানটি সাঈদ খান পন্নীর পরবর্তী বংশধর করটিয়ার জমিদার পরিবারের নিকট এখনও রক্ষিত আছে। ১৭৬২ সনে প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পনের ফলে সমৃদ্ধ নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে বলে অনেক গবেষকেরা মনে করেন। নগরটি বিধ্বস্ত হবার কারণে মঈন খান পন্নী ১৭শ শতকের শেষ দিকে আতিয়া ত্যাগ করে বর্তমানে মির্জাপুর থানাধীন গোড়াই (গৌড় থেকে?) যান। মঈন নগর নাম দিয়ে নতুন দপ্তর স্থাপন করে জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন এবং আতিয়া মসজিদের জন্য মাসিক বরাদ্দ অব্যাহত রাখেন। তারপর সাদাত আলী খান পন্নী ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় গোড়াই মঈন নগর হতে

করটিয়ায় নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন। গোড়াই মঈন নগরে এখনও পুরাতন বসতবাড়ি ও মস্তানগর নামে দূর্গের ভগ্নাবিশেষ এবং হযরত মঈন খান পন্নী মাহবুবে কিরবিয়া (র.) এর মাজার বিদ্যমান।

সমৃদ্ধ জনপদ আতিয়া তার ঐতিহ্যের রেশ ধরে ১৮৬৬ খ্রি. থানা এবং ১৮৬৯ খ্রি. ৩ মে মহকুমার মর্যাদা পায় কিন্তু ১৮৭০ খ্রি. ১৫ নভেম্বর আতিয়া থেকে টাঙ্গাইলের মহকুমায় স্থানান্তর হয়। ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ নগরী আতিয়া বর্তমানে কেবল ইউনিয়নের মর্যাদা দিয়ে টিকে আছে। আতিয়ার প্রশাসক বায়েজীদ খান পন্নীর পিতা গৌড়ের সুলতার সোলায়মান খান কররানির শাসনামলে বাংলাদেশ ও বিহারের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র সমূহে পাঁচটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হলো- সোনারগাঁও, বিহার দিনাজপুর, পাণ্ডুয়া এবং চট্টগ্রামের বাশখালী থানার ইলশা গ্রামে। সমৃদ্ধ নগরী আতিয়াতেও তাঁর সময়কার শিলালিপি ও মুদ্রা পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কারণ সুলতার সোলায়মান কররানির জ্যেষ্ঠ পুত্র টাঙ্গাইলের বাজিতপুরে বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসক হিসেবে এসেছিলেন এবং বায়েজীদ খান পন্নী, সাঈদ খান পন্নী এবং শাহ আলী বাবা আদম কাশ্মির (র.) এর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ জনপদ আতিয়ার আরও অজানা ইতিহাস উদ্ঘাটন করতে সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ও গবেষকদের এদিকে দৃষ্টি ফেরানো দরকার।

(লেখক- ওমর খান পন্নী, ভাইস চেয়ারম্যান, টাঙ্গাইল জেলা রেফারি সমিতি)

মাসিকপত্র আখ্‌বারে এসলামীয়া
হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অনন্য কীর্তি

–শামিমা আক্তার সুমি

বাংলা চর্চায় মুসলিমদের অগ্রদূত

বাংলার মুসলমানদের ভাষা বাংলা হলেও উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে বাংলার কদর ছিল না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তৎকালীন সময়ে আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা নিজেদেরকে বাঙালির বদলে আরবি, ইরানি, তুর্কি কিংবা পাঠান বলে দাবি করত। যদিও তাঁরা বাস্তব প্রয়োজনে বাংলার ব্যবহার করত তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি, ফারসি বা অনন্যোপায় হয়ে উর্দুর চর্চা করত। এমনকি 'রাজভাষা' ইংরেজির চর্চাতে তাদের অনেকেরই কোনো আপত্তি ছিল না। আতরাফ বা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও এ প্রবণতা ক্রমেই বিস্তার লাভ করছিল। বাংলাকে হিন্দুয়ানি বা অনৈসলামিক ভাষা মনে করা হতো এবং এ ভাষায় ইসলামি গ্রন্থ-রচনা কিংবা কোরআন, হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতির অনুবাদ অনুচিত বা ধর্মবিরোধী কাজ বলে মনে করা হতো। ঠিক এ রকম প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী পাঠান জমিদার ধর্মপ্রাণ পন্নী পরিবার বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা শুরু করে যা তৎকালীন সময়ে এক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

এছাড়াও ব্রিটিশ শাসকদের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা প্রচারের নীতি মুসলিমদেরকে ১০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেও মুসলমানেরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদীক্ষাকে হারাম বলে মনে করত। এ অবস্থা থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে টেনে তোলার জন্য পন্নী পরিবার বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর মধ্যে মাননীয় এমামুয্‌যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর জীবন:

সুলতান সোলায়মান খান কররানির ১৩তম বংশধর সা'দত আলী খান পন্নী টাঙ্গাইলের করটিয়ায় পন্নী বংশের ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সা'দাত আলী খান পন্নীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী (১৮৪৭-১৮৯৬) উত্তরাধিকারসূত্রে করটিয়ার জমিদারি লাভ করেন। কিন্তু হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ১০ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। অন্ধ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে জমিদারির যাবতীয় দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর মা জমরদুন্নেসা খানমের উপর। বর্তমানে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত বালিয়াদীর জমিদার চৌধুরী হোসেন উদ্দিনের কন্যা জমরদুন্নেসা পূর্ব থেকেই জমিদারির কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মোহরানা ও হেবাসূত্রে নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থানার দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন। কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে কোনো বিনিময় ব্যতিরেকে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করলে তাকে হেবা বলে।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ১৮৭১ সনে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের একজন শাহজাদী আয়েশা খানমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন যিনি অটোমান সাম্রাজ্যের ৩১ তম সুলতান আবদুল মাজেদ (Abdülmecid; 25 April 1823 – 25 June 1861) ভাগ্নী ছিলেন।

দৃষ্টিহীনতাও যাঁকে আটকাতে পারেনি:

মাহমুদ আলী খান পন্নীর দৃষ্টিহীনতা তাকে সমাজচিন্তা বা জ্ঞানসাধনা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি সর্বদার জন্য জ্ঞানী-গুণীজনদের দ্বারা পরিবৃত

থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি শারীরিকভাবে অসম্ভব শক্তিশালী ছিলেন, তার অন্যান্য অনুভূতিগুলো দৃষ্টিমান ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুরধার। তার মেধা, চিন্তা ও বিচারক্ষমতা আজও প্রবাদতুল্য। বাল্যকালেই তিনি কোর'আন শরিফ মুখস্থ করে হাফেজ হিসেবে খ্যাতি পান। ফার্সি ও উর্দু ভাষাও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ব্যক্তিজীবনে একনিষ্ঠ ধার্মিক মাহমুদ আলী সাধনা ও আধ্যাত্মিকতায় একজন উঁচু স্তরের কামেল ব্যক্তি হিসাবে সকলের কাছে সমাদৃত হন। তাঁর কর্মকাণ্ড অধিকাংশই ছিল ধর্মভিত্তিক। ইসলাম প্রচার তাঁর জীবনের একটা ব্রত ছিল। একাজে তিনি সুযোগ্য সাথী হিসেবে পান টাঙ্গাইলের সুরাজ (মতান্তরে চারান) গ্রামের মৌলবি মোহাম্মদ নঈমুদ্দীনকে। তাঁদের দুজনের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল।

ছাপাখানা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:

করটিয়ায় সা'দাত আলী খান পন্নীর জীবদ্দশায় একটি প্রেস স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশে একজন মুসলমান জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্ভবত এটিই প্রথম ছাপাখানা। পরবর্তীকালে হাফেজ মাহমুদ আলী করটিয়াতে ১৮৮৫ সালের ২২ মার্চ (১২৯১ বঙ্গাব্দে ৮ চৈত্র) একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। 'মাহমুদিয়া যন্ত্র' বা 'মাহমুদিয়া প্রেস' নামে পরিচিত উন্নতমানের এ প্রেসটি জমিদারির নিজস্ব কাজের পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর প্রেস থেকে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। পন্নী পরিবারের প্রতাপ ও জনপ্রিয়তা এতই বিপুল ছিল তাদেরকে অবজ্ঞা করাও ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

করটিয়া জমিদার বাড়ির প্রেস হতে রসিকলাল বসু রচিত 'আটীয়ার ইতিহাস', ফতোয়ায়ে আলমগিরী (অনুবাদ), মওলানা নঈম উদ্দিনের জুবদাতুল মাসায়েল প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

মুসলিম জাগরণে আখ্‌বারে এসলামীয়া:

মাহমুদিয়া প্রেস থেকে হাফেজ মাহমুদ আলীর অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ও মৌলবি নঈমুদ্দীনের সম্পাদনায় 'আখ্‌বারে এসলামীয়া' নামে একটি মাসিকপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হত। এপ্রিল, ১৮৮৪ তে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দশ বছর চলার পার মাঝখানে দুই বছর বন্ধ থাকে। এপ্রিল, ১৮৯৫ অথবা ১৮৯৬ থেকে নতুন করে এর প্রকাশ শুরু হলেও মাত্র অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকাটি চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়।

নবপর্যায়ে প্রকাশিত হওয়ার সময় পত্রিকার নামের নিচে লেখা হতো: 'উপদেশ, ধর্মশালা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত, প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সম্মিলিত মাসিক পত্রিকা'। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, মহাপুরুষদের জীবনী, মুসলিম ঐতিহ্য এবং সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে এতে প্রকাশিত হয়েছে। শরা-শরিয়ত সংক্রান্ত রচনা ছিল পত্রিকার মুখ্য বিষয়। হানাফি-আহলে হাদীস ও গোবধ-গোরক্ষা বিষয়ে টাঙ্গাইলের আরেকটি পত্রিকা মাসিক আহমদীর সঙ্গে এ পত্রিকার দীর্ঘকালের বিতর্ক ছিল। মৌলবি নইমুদ্দীন স্বয়ং ইসলাম ধর্মে পণ্ডিত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে হিন্দু ধর্মে শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ছিলেন, মৌলবি নঈম উদ্দিন সে সময় ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে তেমনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। গোবধ-গোরক্ষা সম্পর্কে তিনি মীর মশাররফ হোসেন এর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। ২১ আষাঢ় ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (১৮৮৯) মীর মশাররফ মৌলবি নঈমুদ্দীনের বিরুদ্ধে 'আটিয়া প্রথম মুনসেফী আদালত'- এ একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। কিন্তু রায় প্রকাশের পূর্বেই ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর হাফেজ মাহমুদ আলীর বিশেষ প্রচেষ্টায় উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বা 'ছোলেনামা' সাক্ষরের মাধ্যমে এই মামলার নিষ্পত্তি ঘটে। মামলাটি তৎকালে বহুল আলোচিত হয়েছিল। বিষয়টি হচ্ছে মীর মোশাররফ হোসেন গোজীবন নামে একটি প্রহসন লিখেছিলেন যাতে মুসলমান ও হিন্দুর সম্প্রীতি রক্ষার জন্য গরু কোরবানি স্থগিত

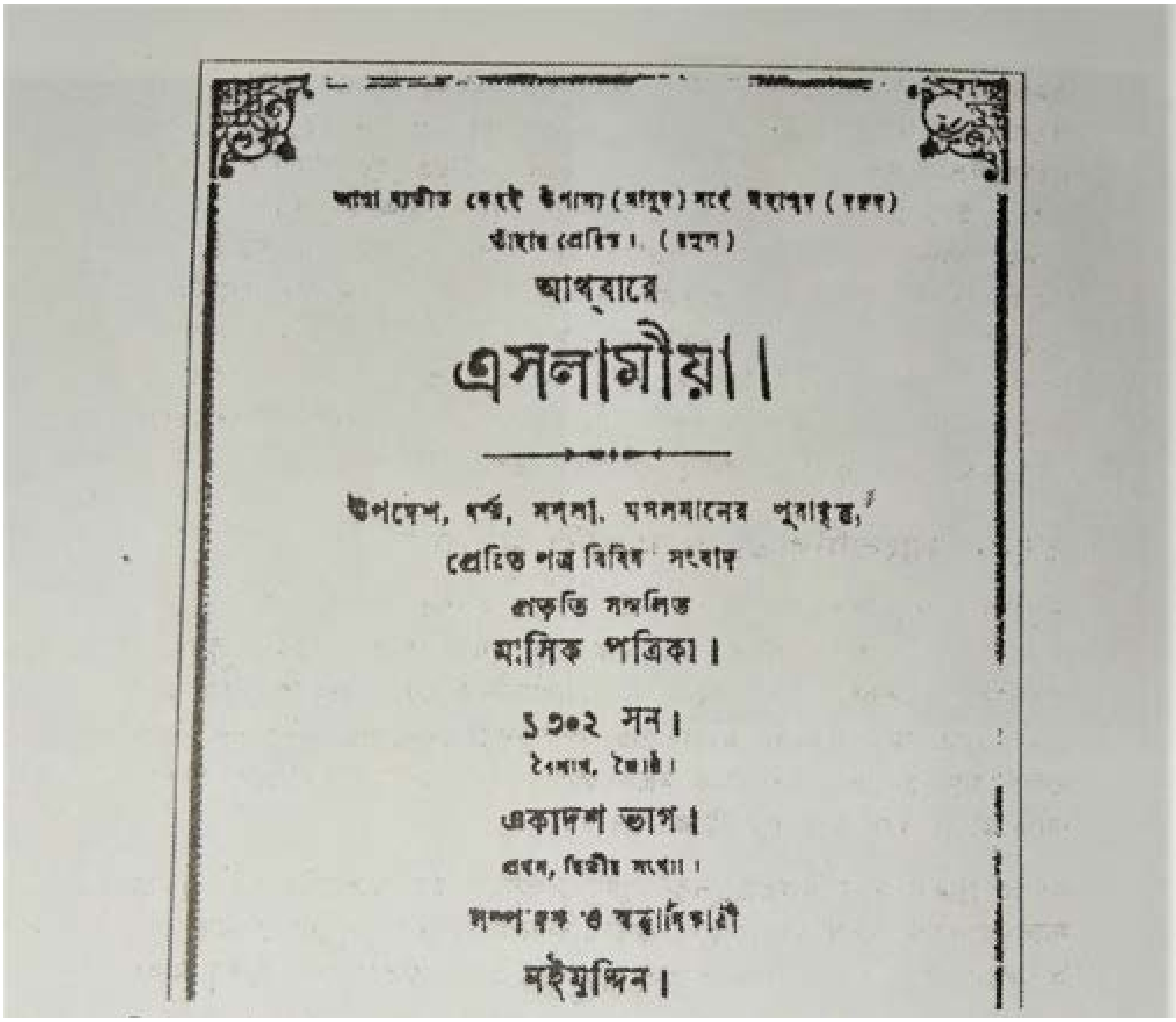

আল্লা ব্যতীত কেহই উপাস্য (মাবুদ) নহে মহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত। (রছুল)

আখ্‌বারে

এসলামীয়া।

উপদেশ, ধর্ম্ম, মছলা, মছলমানের পুরাবৃত্ত,
প্রেরিত পত্র বিবিধ সংবাদ
প্রভৃতি সম্বলিত
মাসিক পত্রিকা।

১৩০২ সন।
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ।

একাদশ ভাগ।
প্রথম, দ্বিতীয় সংখ্যা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী
মইযুদ্দিন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত আখবারে এসলামীয়ার আখ্যান পত্রের অংশ।

করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। মৌলবি নঈম উদ্দিন এই প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন এবং পাল্টা জবাব হিসাবে গো-কাণ্ড নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সমঝোতায় আসার পর মীর সাহেব 'গোজীবন' পুনঃমুদ্রিত করবেন না বলে আশ্বাস দিলে মৌলবি সাহেব তাঁর তারিফ করেন। আদর্শের দিক থেকে দুই সাহিত্যেকের মধ্যে কলমযুদ্ধ হলেও ব্যক্তিজীবনে তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল প্রচুর। প্রায়ই তাঁরা একত্র মিলিত হয়ে পারিবারিক সুখ-দুঃখ থেকে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। নাম থেকেই বুঝা যায় আখ্‌বারে এসলামীয়া ছিল একটি ধর্মীয় পত্রিকা। খ্রিষ্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের যেসব প্রভাব মুসলমান সমাজকে কলুষিত করছিল তা দূর করা এ পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মফস্বল থেকে প্রকাশিত হওয়ার কারণে অনেকে একে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলেও সমকালীন মুসলিম সমাজের ওপর পত্রিকার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে ফিচার ও মুসলিম জাহানের বিশেষ খবরাদি ছাপা হতো। এর প্রতিসংখ্যার সম্পাদকীয় কলামটি ছিল খুব আকর্ষণীয়। তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কাজগুলো পাঠকসমাজে দারুণ সাড়া

জাগিয়েছিল। এটি মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য। তৎকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারাদেশে চলতো এ পত্রিকা।

বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আখ্‌বারে এসলামীয়া পত্রিকা। সে সময়ে করটিয়ার 'আখ্‌বারে এসলামীয়া' পত্রিকাটি ছাড়া সব ক'টি পত্রিকাই প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। বলা চলে, বাংলার মুসলমানদের সাংবাদিকতার এটাই ছিল সূচনা পর্ব।

জাতীয় জাগরণে জনমত সৃষ্টিতে সংবাদপত্র সবসময়

এটি মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য। তৎকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারাদেশে চলতো এ পত্রিকা। বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আখ্‌বারে এসলামীয়া পত্রিকা। সে সময়ে করটিয়ার 'আখ্‌বারে এসলামীয়া' পত্রিকাটি ছাড়া সব ক'টি পত্রিকাই প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। বলা চলে, বাংলার মুসলমানদের সাংবাদিকতার এটাই ছিল সূচনা পর্ব।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যে দুই শতাব্দিব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে। সনাতনধর্মী ও মুসলিমদের মধ্যে বহু সংগঠন ও পত্রিকা হয়েছিল যেগুলো ধর্মীয় চেতনাকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথে প্রবাহিত করেছে। উনিশ শতকের এই পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্য সাধনা ও ইংরেজ ও তাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত বর্ণহিন্দুদের যৌথ শোষণ-লুণ্ঠন, ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের কারণে পিছিয়ে পড়া বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মুসলমানগণ মূলত এই জাগরণ প্রয়াসের কাণ্ডারী ছিলেন। তবে এ কাজে সমাজহিতৈষী বিত্তবান মাহমুদ আলী খান পন্নী বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও রাজনীতিবিদ আবুল কালাম শামসুদ্দীন এ বিষয়ে পরবর্তীতে লিখেছেন, "বাঙ্গালি মুসলমান কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের সত্যিকার চেষ্টা হয় সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, যাদের সমাজ হিতৈষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে মাহমুদ আলী খান পন্নী ছিলেন এদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কাছে বাংলার মুসলমানেরা নানাভাবেই ঋণী।

আখ্‌বারে এসলামীয়া ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকার প্রতি হাফেজ মাহমুদ আলী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ১৮৯০ সালে মীর মোশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে পাক্ষিক 'হিতকরী' প্রকাশিত হতো সম্পূর্ণরূপে টাঙ্গাইলের হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর আর্থিক সহায়তায়।

মুসলমানদের 'প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র' হিসেবে অভিহিত 'সুধাকর' পত্রিকাটি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশের পরপরই তীব্র আর্থিক সংকটে পড়ে । এ অবস্থায় তিনি 'মোটা রকমের' আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পত্রিকাটি চালু রাখতে সহায়তা করেন। সম্ভবত তিনি পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী ও শেখ আবদুর রহিম প্রণীত ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ সংস্কার (১৮৯০) গ্রন্থখান প্রকাশেও সহায়তা করেছিলেন। এ গ্রন্থটি তাঁর নামে (হাফেজ মাহমুদ খান চৌধুরী) উৎসর্গ করা হয়।

প্রথম বাংলা কোর'আন অনুবাদ:

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ও মৌলবি নঈমুদ্দীনের যৌথ প্রচেষ্টার একটি অনন্য সাফল্য হচ্ছে বাংলাভাষায় আল কোরআন অনুবাদ। উনিশ-শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত রক্ষণশীল বাঙালি মুসলমান সমাজের কেউ মাতৃভাষায় কোরআন শরীফ অনুবাদে এগিয়ে আসেননি। আল-কোরআনের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণার অধিকারী এবং অনেকেই তাকে মৌলবি হিসেবে অভিহিত করত। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫

করটিয়া সাদত কলেজে রক্ষিত হাতেলেখা পবিত্র কোরআন শরীফ।

খ্রিস্টাব্দের মধ্যে '১২ খণ্ডে কয়েকটি উপখণ্ডে' গিরিশ চন্দ্রের অনুবাদকর্ম সম্পন্ন ও প্রকাশিত হয়। বাংলায় আল-কোরআনের এই অনুবাদ প্রকাশের সাথে সাথে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি সমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাষা ও কতিপয় শব্দের বিতর্কিত অনুবাদ, অনুবাদের সাথে মূল আরবি পাঠ না-থাকা এবং অনুবাদকের ইসলাম ধর্মাবলম্বী না-হওয়া প্রভৃতি কারণে রক্ষণশীল বাঙালি মুসলিম সমাজে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ খুব বেশি জনপ্রিয় হতে পারেনি। এ অবস্থায় ধর্মপ্রাণ হাফেজ মাহমুদ আলীর উৎসাহ-অনুপ্রেরনায় ও সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মৌলবি গোলাম সারওয়ার-এর সহযোগিতায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রথম মৌলবি নঈমুদ্দীন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে আল-কোরআন বঙ্গানুবাদের কাজ শুরু করেন। তিনি পবিত্র কোর'আনের টীকাসহ পূর্ণ অনুবাদ করেন যা ১৮৮৭ সনে করটিয়ার মাহমুদিয়া প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোর'আন শরীফের **১ম** থেকে **১০** পারা পর্যন্ত সম্পূর্ণ, **১২, ১৩, ২২, ২৩, ২৭** ও 'সহজ ও সুন্দর ভাষায়' তাঁর অনূদিত কোর'আন শরীফ (বিশেষত আমপারা) সমকালীন মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হয়। তাঁর কোর'আনের হাতে লেখা কপিটি এখনো সা'দত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। এর প্রকাশক ছিলেন মীর আতাহার আলী।

আল-কোর'আন ছাড়াও হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবি নঈমুদ্দীন বুখারী শরীফের অনুবাদের কাজও শুরু করেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ তাঁর এই অনুবাদকর্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে করটিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি আরো প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবেই হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী সর্বপ্রথম কোরা'আন ও বুখারি শরিফ অনুবাদ করিয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন যদিও তাঁর এই কীর্তি খুব কমই স্মরণ করা হয়। হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর 'আদেশানুসারে'

মৌলবি নঈমুদ্দীন শরা বা ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহকে উপজীব্য করে জুবদাতুল মাসায়েল (১ম খণ্ড) বাঙালি মুসলিম সমাজে এত বেশি জনপ্রিয় হয় যে ১৮৭৩ থেকে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বইটির দশটি সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। এছাড়া হাফেজ মাহমুদ আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবি নঈমুদ্দীন ইনসাফ (১৮৮৬), ধোকা ভঞ্জন (১৮৮৯), গো-কাণ্ড (১৮৯৩), জুবদাতুল মসায়েল (২য় খণ্ড ১৮৯১), সেরাতল মস্তাকিম (১৮৯২), মৌলুদ শরীফ (১৮৯৫)সহ প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সকল গ্রন্থ মীর সা'দাত হোসেন বা মীর আতাহার আলী কর্তৃক করটিয়া থেকে প্রকাশিত হয়।

ইসলাম প্রচার ও সমাজকল্যাণ:

উপরে উল্লেখিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবি নঈমুদ্দীন ইসলামের সেবায় আরও কিছু পদক্ষেপ নেন। এর মধ্যে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'আঞ্জুমানে মঈনুল ইসলাম'-এর প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম প্রচারই ছিল এই সংগঠনের প্রধান বা মৌলিক উদ্দেশ্য। ধারণা করা যায়, সমকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আঞ্জুমানে মঈনুল ইসলামের সদস্য হয়েছিলেন। বিষাদসিন্ধুর লেখক মীর মশাররফ হোসেন এই সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক ইসলাম প্রচারক পত্রিকা থেকে জানা যায়, "আটিয়ার আঞ্জুমানে মঈনুল ইসলামের পক্ষ হইতে সম্পাদক মৌলবি নঈমুদ্দীন সাহেব ও করটিয়ার বিখ্যাত মৌলবি গোলাম সারওয়ার সাহেক বিভিন্নস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।" এ সংবাদ থেকে বুঝা যায়, সমকালে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আঞ্জুমানে মঈনুল ইসলামের কর্মকাণ্ড বেশ সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী হিন্দু ধর্মের উন্নয়নেও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন। 'হিন্দুধর্মের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে' সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা'- এর নতুন গৃহ-নির্মাণের জন্য তিনি দুইশত টাকা দান করেন। উল্লেখ্য, সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে পন্নীদের জমিদারি ছিল। যাহোক, এ তথ্য থেকে অন্যধর্মের প্রজাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় সহনশীলতায় পরিচয় পাওয়া যায়।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর পিতা সা'দাত আলী খান পন্নী করটিয়াতে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেছিলেন। হাফেজ মাহমুদ আলী ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এটাকে মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে (Middle English School) রূপান্তরিত করেন। সা'দাত আলীর সময় যে আরবি-ফারসি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃতপক্ষে তা ছিল একটি মক্তব মাত্র। হাফেজ মাহমুদ আলী প্রকৃত অর্থেই একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলবি নঈমুদ্দীন, মৌলবি গোলাম সারওয়ার প্রমুখ দেশবরেণ্য ওলামা এই মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করতেন। মাহমুদ আলীর সময়েই ১৩ চৈত্র ১২১৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯২ খ্রি.) মূল্যবান পাথরখচিত 'অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত' করটিয়া এই মসজিদ ও মাদ্রাসার খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। করটিয়া ছাড়া অন্যান্য স্থানে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও হাফেজ মাহমুদ আলী সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন। অগ্রহায়ণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দের আখ্‌বারে এসলামীয়া পত্রিকা থেকে 'করটীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত জনাব হাফেজ মাহমুদ আলী খাঁ সাহেব' কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল স্কুলের দালান নির্মাণের জন্য 'পাঁচ সহস্র' টাকা দানের কথা জানা যায়। তিনি ঢাকা মাদ্রাসার ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল নির্মাণের জন্যও পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, সে সময় প্রতিমণ ধানের দাম ছিল মাত্র আড়াই টাকা। অতএব, খুব সহজেই বুঝা যায়, সমকালীন বিচারে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় করেছিলেন।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিশোর বা তরুণ বয়সে ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে তিনি সিপাহী বা বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আখ্‌বারে এসলামীয়া পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায়

যে, তিনি কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং রাজনীতিতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর উৎসাহ-উদ্যোগ ও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মৌলবি নঈমুদ্দীন ও মৌলবি গোলাম সারওয়ার প্রমুখের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে করটিয়া সমগ্র বাংলায় একটি অনন্য স্থান দখন করতে সমর্থ হয়।

হাফেজ মাহমুদ আলীর সাথে সমকালীন কোনো জমিদার, বিশেষত মুসলিম জমিদারের তুলনা চলে না। তাঁর সময়ে করটিয়া ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তার নামের স্মৃতি বহন করছে করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এইচ. এম. ইনিস্টিটিউশন যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া সাহেব। এসএসসি পর্যন্ত এ স্কুলেই পড়াশুনা করেছেন এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তাঁর সময়ে বা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সময়ে করটিয়াতে বহু জ্ঞানী-গুণীর সম্মিলন ঘটেছিল। এদের মধ্যে মৌলবি নঈমুদ্দীন, মৌলবি গোলাম সরওয়ার ও কথা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের কথা পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কবি ও ইসলাম প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (যশোর), মুন্সী জুমিরুদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (সিরাজগঞ্জ), কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কোনো না কোনোভাবে পন্নী পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এমামুযযামানের পূর্বপুরুষগণ ব্রিটিশ শাসনকে কোনোদিনই হৃদয় থেকে গ্রহণ করেন নি, বরং তারা সর্ব উপায়ে চেষ্টা চালিয়েছেন বাংলার মানুষের হৃদয়ে স্বাধিকার চেতনার অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে। মোঘল আমল থেকেই সিলেটে কিছু অঞ্চল থেকে শুরু করে রাজশাহী পর্যন্ত, ময়মনসিংহ থেকে শুরু করে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃতি বিরাট এলাকার জমিদার ছিলেন তারা। এই পন্নী পরিবারই মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার তথা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের বিস্তারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. ময়মনসিংহের সাময়িকী ও সংবাদপত্র- আলী আহম্মদ খান আইয়োব
২. বাংলায় মুসলিম জাগরণে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী- সুলায়মান কবীর
৩. বাংলাপিডিয়া
৪. বিভিন্ন ওয়েবসাইট

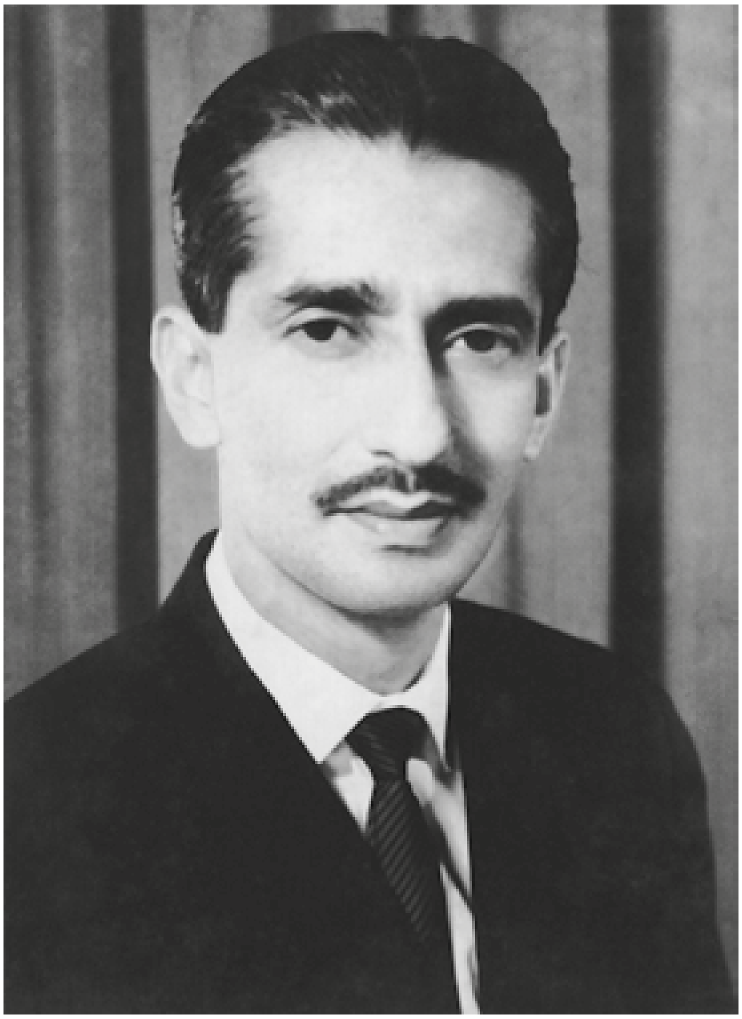

এমামুয্যামান
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
প্রতিষ্ঠাতা, হেযবুত তওহীদ

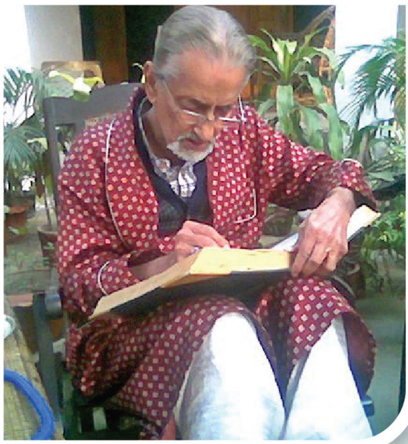

DAUD MAHAL